HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ২য় পত্র

অধ্যায় ০২ : বাংলাদেশের কৃষি

টপিক – ০১ কৃষির কাঠামো

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: কৃষির কাঠামো
টপিক ০২: কৃষির উপখাত
টপিক ০৩: কৃষিখামার ও কৃষিজোত
টপিক ০৪: কৃষিপণ্যের বিপণন
টপিক ০৫: কৃষিখাতে পরিবর্তনের ধারা
টপিক ০৬: কৃষিঋণ
টপিক ০৭: বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে সরকারের গৃহীত কর্মসূচী
টপিক ০৮: কৃষি ও পরিবেশ
টপিক ০৯: বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে গৃহীত ব্যবস্থাদি
টপিক ১০: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান
টপিক ১১: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

কৃষির কাঠামো

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

কৃষির কাঠামো

কৃষির ধারণা।Concept of Agriculture

কৃষি মানুষের আদিম পেশা। মানবসভ্যতার সূচনা হয়েছে কৃষি দ্বারা। মানুষের জীবনধারা, সভ্যতার ক্রমবিবর্তন, সমাজকাঠামো কৃষিকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠেছে।

ল্যাটিন শব্দ Ager এবং Cultura থেকে ইংরেজি Agriculture শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। এক্ষেত্রে Ager অর্থ ভূমি এবং Cultura শব্দের অর্থ চাষ করা। তাই ভূমি চাষ করে ফসল উৎপাদন করাকে কৃষি বা Agriculture বলে।

আর. এল. কোহেন (R. L. Kohen) এর মতে, কৃষি হচ্ছে ভূমি চাষাবাদের বিজ্ঞান এবং শিল্প। Hibbard এর মতে কৃষি হচ্ছে সম্পদ ব্যবহার ও সম্পদ আহরণের মধ্যে একটি সম্পর্ক। তাই কৃষি শব্দটি উৎপাদন, বাছাইকরণ, বাজারজাতকরণ, শস্যবণ্টন ও গুদামজাতকরণের সাথে সম্পর্কিত।

কৃষির কাঠামো

বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত কৃষিনির্ভর। কৃষি কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে এর কাঠামো গড়ে ওঠেছে বিধায় তৃণমূল থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত কৃষির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের অর্থনীতিতে কৃষি এককভাবে বৃহত্তম খাত। কর্মসংস্থানের দিক থেকে কৃষি এখনো সর্ববৃহৎ খাত। এখনও শ্রমশক্তির ৪৫.০০ ভাগ কৃষিক্ষেত্রে নিয়োজিত (LFS-2023)।" গুরুত্বের দিক থেকে তৈরি পোশাক ও নিটওয়্যার রপ্তানির পরেই কৃষির (প্রাথমিক পণ্য ও কৃষিভিত্তিক শিল্পজাত দ্রব্য সমন্বয়ে) অবদান। খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা অর্জন, দারিদ্র্য দূরীকরণ, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং টেকসই (Sustainable) অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষি প্রধান ভূমিকা পালন করছে। লাভজনক, টেকসই ও পরিবেশবান্ধব একটি কৃষি ব্যবস্থা জনসাধারণের দীর্ঘমেয়াদি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অপরিহার্য। এদেশের এঁটেল, দোঁআশ ও এঁটেল-দোঁআশ মাটি এবং গভীর পলিমাটিতে ধান, পাট, ইক্ষু, গম, ভুট্টা, আলু এসব শস্য ভালো উৎপাদন হয়।

কৃষির কাঠামো

দেশজ উৎপাদনে (GDP) সার্বিক খাতসমূহের অবদানের কাঠামোগত পরিবর্তন :

	অবদান (শতকরা হার)						
খাত	১৯৮০-৮১	১৯৮৫-৮৬	১৯৯৫-৯৬	২০০৫-০৬	২০১৬-১৭	২০২২-২৩	২০২৩-২৪*
কৃষি	৩৩.০৭	৩১.১৫	২৫.৬৮	১৯.০১	১৩.৬২	১১.৩০	১১.০২
শিল্প	১৭.৩১	১৯.১৩	২৪.৮৭	২৫.৪০	৩২.৯৮	৩৭.৬৫	৩৭.৯৫
সেবা	৪৯.৬২	৪৯.৭৩	৪৯.৪৫	৫৫.৫৯	৫৩.৪০	৫১.০৫	৫১.০৪
মোট	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো * সাময়িক; ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে উপাত্তসমূহের ভিত্তি বছর : ২০১৫-১৬; বা. অর্থ. সমীক্ষা-২০২৪

কৃষির কাঠামো

নিম্নে বাংলাদেশের কৃষি কাঠামো আলোচনা করা হলো:

১. খামারের আয়তন: জমির মালিকানার ভিত্তিতে খামারের আয়তন ছয় প্রকার। ভূমিহীন শ্রেণিকে বাদ দিলে (i) ০.০৫ একরের কম, (ii) ০.০৫-০.৪৯ একর, (iii) ০.৫০-১.৪৯ একর, (iv) ১.৫০-২.৪৯ একর, (v) ২.৫০-৭.৪৯ একর এবং (vi) ৭.৫০+ একর।

উল্লিখিত ছয় প্রকার খামারকে প্রসারিত দৃষ্টিকোণ থেকে চার ভাগে ভাগ করা হয়। যথা: (ক) প্রান্তিক খামার যাদের জমির পরিমাণ ০.০৫-০.৪৯ একর। (খ) ক্ষুদ্রায়তন খামার যাদের জমির পরিমাণ ০.৫০-২.৪৯ একর। (গ) মাঝারি আয়তনবিশিষ্ট খামার যাদের জমির পরিমাণ ২.৫০-৭.৪৯ একর এবং (ঘ) বৃহদায়তন খামার যাদের জমির পরিমাণ ৭.৫০ একরের অধিক।

কৃষির কাঠামো

২. দারিদ্র্য প্রবণতা: বিবিএস এর খানা আয় ও ব্যয় জরিপ-২০২২ অনুযায়ী গত ছয় বছরে দেশের দারিদ্র্যের হার আরও কমেছে। সার্বিক দারিদ্র্যের হার ২০১৬ সালে ২৪.৩ শতাংশ ছিল যা বর্তমানে ১৮.৭ শতাংশ। অতি দারিদ্র্য হার ২০১৬ সালে ১২.৯ শতাংশ ছিল যা বর্তমানে ৫.৬ শতাংশ। বর্তমানে শহরে দারিদ্র্যের হার ১৪.৭ শতাংশ এবং গ্রামে ২০.৫ শতাংশ। জমির মালিকানার ওপর নির্ভর করেও দারিদ্র্য পরিমাপ করা হয়। যেমন- ২০১০ সালে উচ্চ দারিদ্র্য রেখা ব্যবহার করে দারিদ্র্য পরিমাপে দেখা যায় যে, জনসংখ্যার ৩৫.৪ শতাংশ ভূমিহীন, ৪৫.১ শতাংশের জমির পরিমাণ ০.০৫ একরের নিচে, ৩৩.৩ শতাংশের জমির পরিমাণ ০.০৫-০.৪৯ একর। ২৫.৩ শতাংশের ০.৫০-১.৪৯ একর, ১৪.৪ শতাংশের ১.৫-২.৪৯ একর, ১০.৮ শতাংশের ২.৫-৭.৪৯ একর এবং ৮.০ শতাংশের জমির পরিমাণ ৭.৫ একর বা তার ঊর্ধ্বে। নিম্ন দারিদ্র্য রেখা অনুসারে ২৭.৮ শতাংশের জমির পরিমাণ ০.০৫ একরের নিচে এবং ৩.৭ শতাংশের জমির পরিমাণ ৭.৫ একর বা তার ঊর্ধ্বে।

কৃষির কাঠামো

৩. জিডিপিতে অবদান ২০১২-১৩ অর্থবছরের জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদান ছিল ১৬.৭৭ শতাংশ। বিবিএস হিসাব অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরে স্থির মূল্যে ক্রমাগত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জিডিপিতে সার্বিক কৃষিখাতের অবদান ১১.৬১ শতাংশ। ২০২৩-২৪ (সাময়িক) হিসেবে তা ১১.০২ শতাংশ।

৪. কৃষিতে শ্রমশক্তি: ১৯৯৫/৯৬ অর্থবছরে দেশের শ্রমশক্তির মোট ৬৩.২ শতাংশ কৃষিখাতে নিয়োজিত ছিল, যা ২০২৪ সালে দাঁড়ায় ৪৫.০০ শতাংশ (LFS-2023°) 1

৫. কৃষিপণ্য রপ্তানি: বাংলাদেশের কৃষিখাতের প্রধান প্রধান রপ্তানি পণ্য হলো: হিমায়িত খাদ্য, কাঁচা পাট, পাটজাত পণ্য, চা। এছাড়াও সরকার অপ্রচলিত কৃষিপণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতেও পদক্ষেপ নিয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে কৃষিজাত প্রাথমিক পণ্যের রপ্তানি আয় দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৬৪৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ২০২১-২২ সালে ছিল ১৯১১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০২৩-২৪ (সাময়িক) এ আয় অর্জিত হয়েছে ১০১১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

কৃষির কাঠামো

৬. কৃষি ব্যবস্থাপনা: বিপুল জনসংখ্যার ভারে আক্রান্ত বাংলাদেশ।
সরকারের লক্ষ্য দ্রুত খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন। এ লক্ষ্যে দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য চাহিদা মেটাতে দেশজ খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধিসহ কৃষিখাতের সার্বিক উন্নয়নকে সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করছে। কৃষিখাতের সার্বিক উন্নয়নের জন্য ক্ষুদ্রসেচ সম্প্রসারণ, জলাবদ্ধতা নিরসন, উন্নতমানের ও উচ্চফলনশীল বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

৭. আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ: বাংলাদেশের কৃষিতে ইতোমধ্যে পরমাণু ও বায়োটেকনোলজি পদ্ধতি ব্যবহার করে লবণাক্ততা সহিষ্ণু এবং স্বল্প সময়ের শস্যের জাত (সর্বোচ্চ ১১০ দিন) ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

৮. কৃষক-সহায়তা কর্মসূচি: কৃষি উপকরণে ভর্তুকি বৃদ্ধি, ন্যায্যমূল্যে কৃষি উপকরণ সহজলভ্যকরণ ও এর সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, লক্ষ্যভিত্তিক কৃষি সম্প্রসারণ, কৃষিজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, ফসল সংরক্ষণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণসহ সকল কৃষিজাত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

৯. কৃষিবিমার প্রচলন: দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকদের উৎপাদিত শস্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে নষ্ট হওয়ার কারণে তাদেরকে শস্যমূল্য সহায়তার জন্য কৃষিবিমার প্রচলন করা হয়েছে।

কৃষির কাঠামো

১০. কৃষিপণ্যের ধরন: বাংলাদেশের কৃষিতে দু'ধরনের ফসল উৎপাদিত হয়। একটি খাদ্যশস্য ও অপরটি অর্থকরী . ফসল। যেমন- ধান, গম, ভুট্টা, আলু, তৈলবীজ, ডাল, মসলা, ফলমূল, শাক-সবজি প্রভৃতি হলো খাদ্যশস্য এবং পাট, চা, তামাক, তুলা, রেশম, রাবার, ইক্ষু ইত্যাদি হলো অর্থকরী ফসল।

১১. কৃষিখাত ও উপখাত: পূর্বে কৃষির বিভিন্ন উপখাত হিসেবে শস্য/ফসল, মৎস্য, পশু ও বনজ সম্পদকে বিবেচনা করা হতো। বর্তমানে কৃষির উপখাত হলো-শস্য ও শাকসবজি, প্রাণিসম্পদ এবং বনজ সম্পদ। মৎস্য সম্পদ বর্তমানে উৎপাদনের ভিত্তিতে পৃথক খাত হলেও সার্বিক কৃষিখাতের অংশ।

১২. খাদ্যশস্য উৎপাদন: আশির দশকের প্রারম্ভে (১৯৮০/৮১) চালের উৎপাদন ছিল প্রায় ১৩৯ লক্ষ মেট্রিক টন। বর্তমানে বিভিন্ন কারণে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ প্রতি বছর ১.২ শতাংশ হারে হ্রাস পেলেও এ উৎপাদন ২০২২-২৩ সালে দাঁড়ায় ৪৬৭.০৪ লক্ষ মে. টন।** এক্ষেত্রে গম ১১.৭১ ও ভুট্টা ৬৪.৩২ লক্ষ মে. টন উৎপাদন হয়েছে। ২০২৩-২৪ সালে খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫১৩.৪৫ লক্ষ মে. টন।

কৃষির কাঠামো

১৩. খাদ্যশস্য আমদানি ১৯৯৫/৯৬ সালে মোট খাদ্য আমদানির পরিমাণ ছিল ২৪.২৭ লক্ষ মে. টন। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে (সংশোধিত বাজেটে) সার্বিকভাবে সরকারি ব্যবস্থাপনায় দেশে খাদ্যশস্য আমদানির পরিমাণ ছিল চাল ও গমসহ ১১.০০ লক্ষ মে. টন। বেসরকারি খাতে ০.০০ লক্ষ মে. টন চাল ও ৩৩.৭৩ লক্ষ মে. টন গমসহ মোট ৩৩.৭৩ লক্ষ মে. টন এবং সার্বিকভাবে মোট খাদ্যশস্য ৩৭.৪৯ লক্ষ মে. টন আমদানি করা হয়েছে। জনসংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেলেও অভ্যন্তরীণ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির কারণে আমদানির পরিমাণ সে হারে বাড়েনি।

১৪. বীজ উৎপাদন: বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) সারা দেশে ২৪টি দানাশস্য বীজ উৎপাদন খামার, ২টি পাট বীজ উৎপাদন খামার, ২টি আলু বীজ উৎপাদন খামার, ৪টি ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদন খামার, ২টি সবজি বীজ উৎপাদন খামার ও ৯০টি চুক্তিবদ্ধ চাষি জোনের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এক্ষেত্রে চাষির সংখ্যা ১,০০,১০০ জন এবং জমির পরিমাণ ২,৫৯,৫৮০.৩২ একর। এ ছাড়া, এ সংস্থা ৯টি উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র ও ১৪টি এগ্রো-সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে উৎপাদিত বিভিন্ন ফসলের চারা, কলম, গুটি ইত্যাদি উৎপাদন ও চাষি পর্যায়ে বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

কৃষির কাঠামো

১৫. সেচ: বৈশ্বিক উষ্ণায়ন, জলবায়ু পরিবর্তন, আন্তর্জাতিক নদীতে পানি প্রবাহ হ্রাস ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় রেখে ভূ-গর্ভস্থ পানির ওপর চাপ কমানোর লক্ষ্যে এবং ভূ-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহারে অপচয় হ্রাসের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেচকৃত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৪-০৫ ও ২০২১-২২ অর্থবছরে সেচভুক্ত এলাকা ছিল যথাক্রমে ৪৬.৫২ ও ৫৬.৮৮ লক্ষ হেক্টর এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা ৫৭.৮৯ লক্ষ হেক্টর।

১৬. কৃষি ঋণ: দেশের খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার তথা সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কৃষিখাত এবং পল্লি অঞ্চলের ভূমিকা সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে কৃষিঋণের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ২০০১-০২ অর্থবছরে কৃষিঋণ বিতরণ করা হয় ৩০১৯.৬৭কোটি টাকা যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রায় ৩০,৮১১.০০ কোটি টাকায় উত্তীর্ণ হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ৩৫,০০০.০০ কোটি টাকা।

কৃষির কাঠামো

১৭. খাদ্যশস্য ধারণ ক্ষমতা: ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জানুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত দেশে খাদ্যশস্যের মোট ধারণক্ষমতা দাঁড়িয়েছে ২২.৭৬ লক্ষ মে. টন যা একই সময় ২০২১-২২ অর্থবছরে ছিল ২১.৮৬ লক্ষ মে. টন। ২০৩০ সালের মধ্যে খাদ্যশস্যের ধারণক্ষমতা মোট ৩০ লক্ষ মে. টনে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়।

বাংলাদেশে আবাদি জমি হ্রাস (প্রতি বছর চাষযোগ্য জমি হ্রাস পাচ্ছে ১.২ শতাংশ হারে), বাড়তি জনসংখ্যার (প্রতি বছর ২২ থেকে ২৫ লক্ষ বৃদ্ধি পাচ্ছে) খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং করোনা মহামারীর অভিঘাত সত্ত্বেও ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রয়েছে। এ সময়ে বাংলাদেশ বিশ্বে ধান উৎপাদনে চতুর্থ স্থান হতে তৃতীয় স্থানে উন্নীত হয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলকে ২০২১ সালে এবং বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউটকে ২০২২ সালে স্বাধীনতা পদকে ভূষিত করার মাধ্যমে এর যথার্থ মূল্যায়ন ও গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ২য় পত্র

অধ্যায় ০২ : বাংলাদেশের কৃষি

টপিক – ০২ কৃষির উপখাত

কৃষির উপখাত

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

কৃষির উপখাত

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪ অনুযায়ী কৃষিখাতকে চারটি উপ-খাতে বিভক্ত করা হয়। খাতসমূহ হলো:ক. শস্য ও উদ্যান, খ. প্রাণিসম্পদ, গ. বনজ সম্পদ ও সহায়ক সেবা এবং ঘ. মৎস্য সম্পদ। কৃষির বিভিন্ন উপখাতের বর্ণনা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

ক. শস্য ও উদ্যান: দেশে উৎপাদিত খাদ্যশস্য, শাক-সব্জি ও মসলাজাতীয় খাদ্যদ্রব্য নিয়ে কৃষির এ উপখাত গঠিত। খাদ্যশস্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ধান (আউশ, আমন, বোরো), গম এবং ভুট্টা। এছাড়া, আলু, ডাল, তৈলবীজ, পাট, বিভিন্ন ধরনের শাক-সব্জি, ফলমূল এবং মসলাজাতীয় খাদ্যদ্রব্য- পেঁয়াজ, রসুন, আদা, ঝিরা, সরিষা, হলুদ, মরিচ, ধন্যা, লং, গোলমরিচ, দারচিনি, এলাচ প্রভৃতি উৎপাদন করা হয়। এটি কৃষির বৃহত্তম উপখাত। এখন দেশে ৬০ ধরনের ২০০টি জাতের সবজি উৎপাদিত হচ্ছে। দানাদার খাদ্য উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে নবম।

কৃষির উপখাত

গত এক দশকে বাংলাদেশে সব্জির আবাদি জমির পরিমাণ ৫ শতাংশ হারে বেড়েছে। এ হার বিশ্বে সর্বোচ্চ (FAO) I স্বাধীনতার পর হতে এখন পর্যন্ত দেশে সব্জির উৎপাদন বেড়েছে পাঁচ গুণ। সবজি উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে ২০তম এবং সবজি উৎপাদন বৃদ্ধির হারের দিক থেকে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে তৃতীয়। গত এক যুগে মাথাপিছু সব্জির ভোগ বেড়েছে ২৫ শতাংশ। ১৯৯৪ সালে দেশে মাথাপিছু সব্জি ভোগের পরিমাণ ছিল ৪২ গ্রাম, এখন তা ৭০ গ্রামের ওপর উন্নীত হয়েছে। এক বছরে সব্জির রপ্তানি আয় বেড়েছে ২৪ শতাংশ এবং দেশে উৎপাদিত বীজ ৯০ শতাংশ।

কৃষির উপখাত

শস্য ও উদ্যান উপখাতে স্থির মূল্যে স্থূল দেশজ উৎপাদন (GDP) এবং GDP এর খাতওয়ারি প্রবৃদ্ধির হার :

	২০০৭–০৮	২০০৮–০৯	২০০৯–১০	২০১৩–১৪	২০২২–২৩	২০২৩–২৪*
GDP (কোটি টাকায়)	৫৬৪৯৪	৫৮০৯৪	৬২৪৯২	৬৮৯৩৮	১৬৪৪৯৮	১৬৯১২৯
GDP প্রবৃদ্ধির হার	৩.৯৯	২.৮৩	৭.৫৭	৩.৭৮	৩.১৫	২.৮২

উৎস : বা. অর্থ সমীক্ষা-২০২৪ * সাময়িক

টেবিলে প্রদত্ত মানসমূহ নিম্নে লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো :

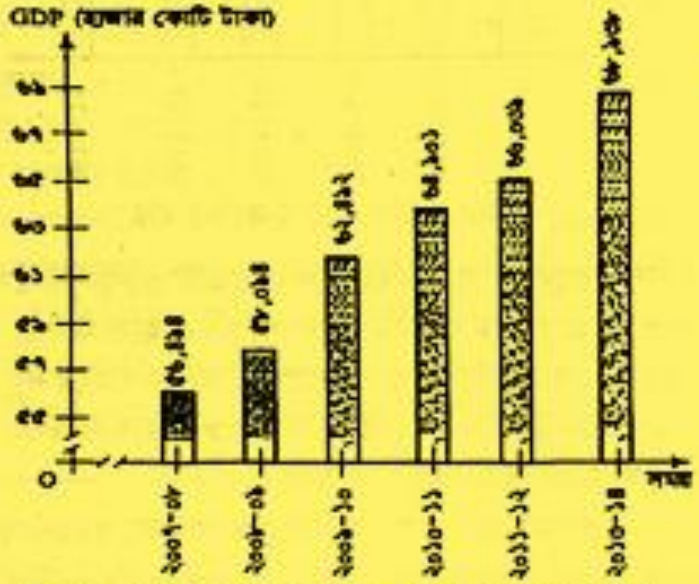

চিত্র : শস্য ও উদ্যান খাতে স্থূল দেশজ উৎপাদন (GDP)

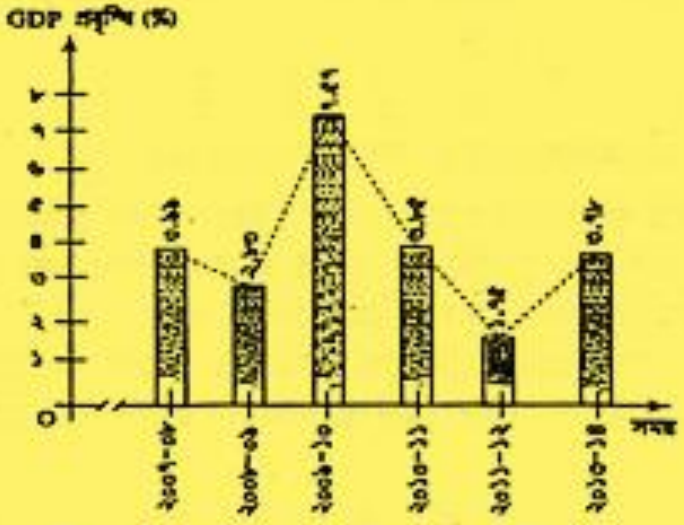

চিত্র : শস্য ও উদ্যান খাতে উৎপাদনে প্রবৃদ্ধির হার

কৃষির উপখাত

খ. প্রাণিসম্পদ: প্রাণিসম্পদ বাংলাদেশের কৃষির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপখাত। জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ উপখাতের অংশ স্বল্প হলেও দৈনন্দিন খাদ্যে মানবদেহের অত্যাবশ্যকীয় প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, চাষাবাদ, চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন ও রপ্তানিতে এবং বিশেষ করে খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এ উপ-খাতের ভূমিকা অপরিসীম। ২০২৩-২৪ (সাময়িক) অর্থবছরের জিডিপিতে এ খাতের অবদান ১.৮০ শতাংশ এবং সার্বিক কৃষিখাতে প্রাণিসম্পদের অবদান ১৬.৩৩ শতাংশ। গবাদিপশুর ঘনত্বে বিশ্বে সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ বাংলাদেশ। প্রতি বর্গ মাইলে ৪৩৬টি, যা এক্ষেত্রে দ্বিতীয় ভারতের তুলনায় প্রায় পৌনে তিন গুণ বেশি। ছাগলের দুধ উৎপাদনে বিশ্বে দ্বিতীয় এবং ছাগলের সংখ্যা ও মাংস উৎপাদনে বিশ্বে চতুর্থ। বাংলাদেশের ব্লাক বেঙ্গল জাতের ছাগল বিশ্বের সেরা জাত হিসেবে স্বীকৃত। বাংলাদেশে প্রাণিজ উৎস হতে দেশে উৎপাদিত খাদ্যপণ্য যেমন: দুধ, মাংস (গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগি) এবং ডিমের পরিমাণ নিয়মিতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরের গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে প্রায় ৫৬৩.৩০ লক্ষ এবং ৩৬৫৮.৫০ লক্ষ। গত এক যুগে মাংস উৎপাদন ৪.৬৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এ সময়ে কৃত্রিম প্রজনন কভারেজ ২৮ শতাংশ থেকে ৫৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।*। ২০২২-২৩ অর্থবছরে দুধের উৎপাদন ছিল ১৪০.৬৮ লক্ষ মেট্রিক টন যা ২০১০-১১ অর্থবছরের তুলনায় ৪.৭৬ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

কৃষির উপখাত

প্রাণিসম্পদ উপখাতে চলতি বাজার মূল্যে দেশজ উৎপাদন (GDP) এবং GDP এর খাতওয়ারি প্রবৃদ্ধির হার :

	২০০৭–০৮	২০০৮–০৯	২০০৯–১০	২০১৩–১৪	২০২১–২২	২০২২–২৩	২০২৩–২৪
GDP (কোটি টাকায়)	১১৩৫৩	১১৬২০	১১৯১২	১৩২৫৮	৬৭৩৯৯	৭৩৬৬৫	৮২০১৪
GDP প্রবৃদ্ধির হার	২.২০	২.৩৫	২.৫১	২.৮৩	৩.১০	৩.১৭	৩.১৫

উৎস : বা. অর্থ. সমীক্ষা-২০২৪ * সাময়িক

লেখচিত্র :

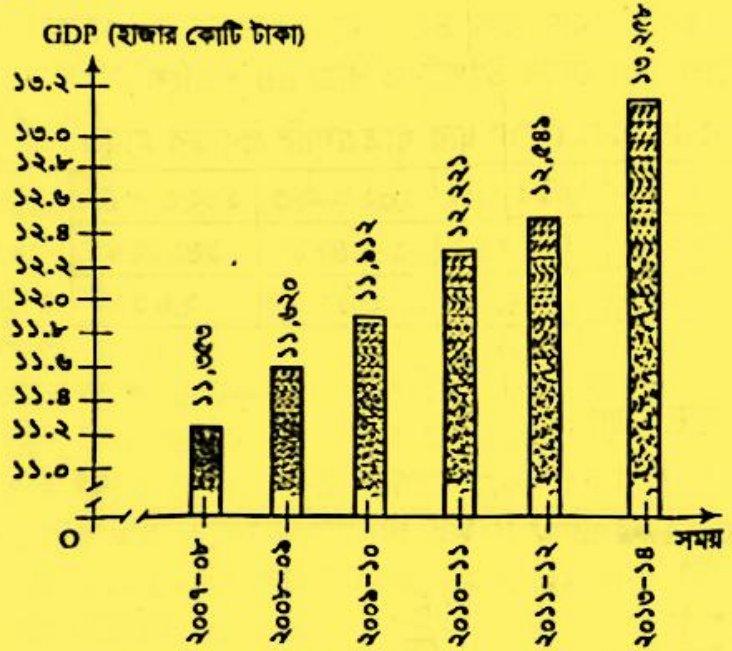

চিত্র : প্রাণিসম্পদের স্থূল দেশজ উৎপাদন (GDP)

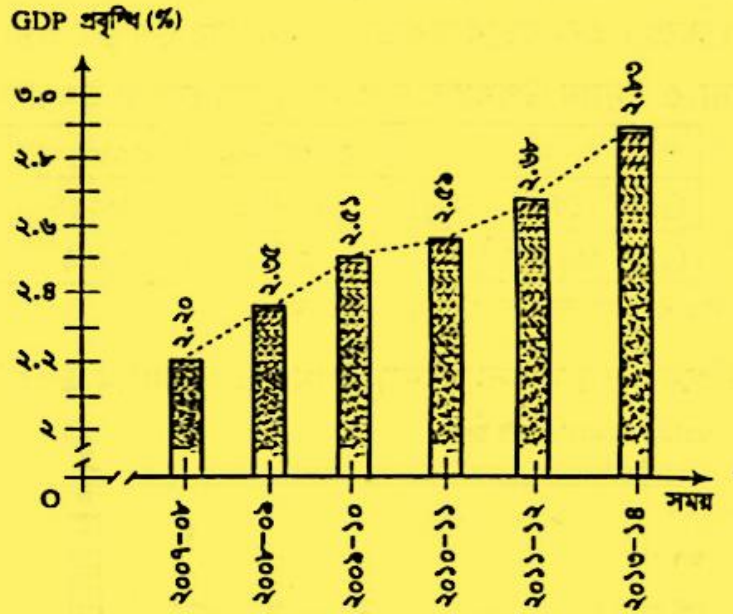

চিত্র : প্রাণিসম্পদের প্রবৃদ্ধির হার

কৃষির উপখাত

গ. বনজ সম্পদ ও সহায়ক সেবা**: বনজ সম্পদ ও সহায়ক সেবা বাংলাদেশের কৃষির অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপখাত। বৃক্ষ, কাঠ, ফল, মধু, জ্বালানি কাঠ প্রভৃতি বনজ সম্পদের অন্তর্গত। দেশে প্রাকৃতিক বনভূমি যখন সংকুচিত হয়ে আসছে, বনের বাইরে বৃক্ষ আচ্ছাদিত এলাকার পরিমাণ ক্রমেই বাড়ছে। ২০০০ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশে বনের বাইরে নতুন করে ২ লক্ষ ১৯ হাজার ৩০০ হেক্টর বৃক্ষ আচ্ছাদিত এলাকা বেড়েছে। এ সময়কালে তিন পার্বত্য জেলায় ৮০ হাজার ৮০০ হেক্টর বনভূমি উজাড় হয়েছে। দেশে মোট ৩১ লক্ষ ৬৫ হাজার ৫০০ হেক্টর বৃক্ষ আচ্ছাদিত এলাকা রয়েছে। -'আইওপি সায়েন্স' জার্নাল, ১৮ অক্টোবর, ২০১৭; যুক্তরাষ্ট্র।

কৃষির উপখাত

বনজ সম্পদ ও সহায়ক সেবা উপখাতে চলতি বাজার মূল্যে স্থূল দেশজ উৎপাদন (GDP) এবং GDP এর খাতওয়ারি প্রবৃদ্ধির হার :

	২০০৭–০৮	২০০৮–০৯	২০১১–১২	২০১৩–১৪	২০২১–২২	২০২২–২৩	২০২৩–২৪
GDP (কোটি টাকায়)	৯৪৪৫	৯৯৬৮	১১৭৪৫	১২৯৫৫	৬৩৭৪৮	৭১৩৩৪	৭৯৫৫৩
GDP প্রবৃদ্ধির হার	৫.২৬	৫.৫৪	৫.৯৬	৫.০১	৫.০৮	৫.১৩	৫.০৮

উৎস : বা. অর্থ. সমীক্ষা-২০২৪ * সাময়িক

লেখচিত্র :

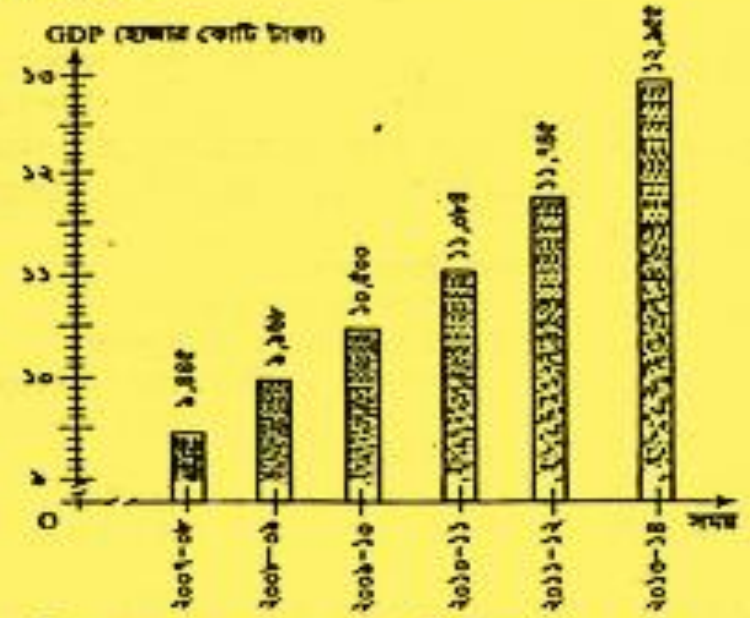

চিত্র : বনজ সম্পদের স্থূল দেশজ উৎপাদন (GDP)

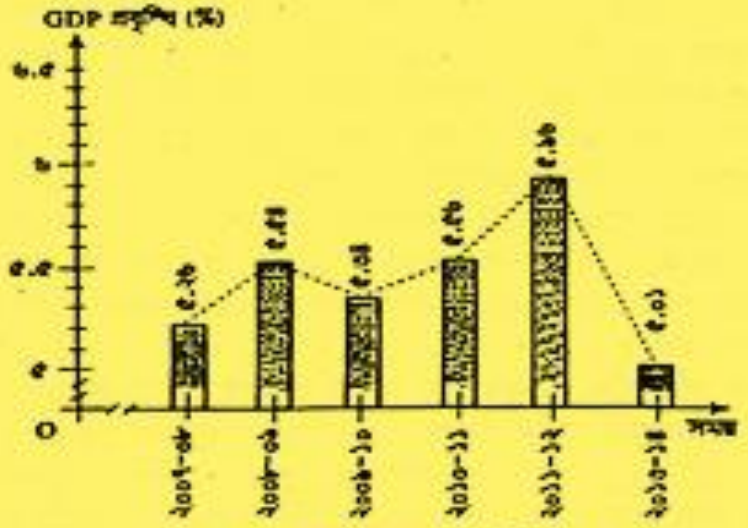

চিত্র : বনজ সম্পদের প্রবৃদ্ধির হার

কৃষির উপখাত

ঘ. মৎস্য সম্পদ: মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষ সরবরাহ বৃদ্ধি করা এ খাতের একটি অন্যতম লক্ষ্য। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হচ্ছে- সমাজভিত্তিক মৎস্য চাষ কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও জোরদারকরণ, খাস জলাশয়ে মৎস্যজীবীদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ, বিল নার্সারি কার্যক্রম গ্রহণ ও মুক্ত জলাশয়ে মাছের পোনা অবমুক্তকরণ, মৎস্য অভয়াশ্রম সৃষ্টি, ঘের ও খাঁচায় মাছ চাষ কার্যক্রম সম্প্রসারণ, ভরাট হয়ে যাওয়া নদী পুনঃখনন করে মাছের আবাসস্থল পুনরুদ্ধার এবং গবেষণার মাধ্যমে উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ। দেশের জনসাধারণের আমিষের চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান, দারিদ্র্যবিমোচনসহ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে মৎস্যসম্পদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।** ২০২২-২৩ অর্থবছরে মৎস্য উৎপাদন হয়েছে ৪৯.১৫ লক্ষ মেট্রিক টন যা ১৯৮৩-৮৪ সালে ছিল ৭.৫৪ লক্ষ মে. টন। ৩৯ বছরের ব্যবধানে মাছের উৎপাদন বেড়েছে ছয় গুণের অধিক। দেশের প্রায় ১ কোটি ৯০ লাখ মানুষ, কর্মক্ষম মানুষের ২৪ শতাংশ এখন কোনো না কোনোভাবে মৎস্য খাতের সঙ্গে যুক্ত। বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু মাছ খাওয়ার পরিমাণ ১৯৯০ সালে ছিল বছরে সাড়ে ৭ কেজি এখন তা ৩০ কেজি।*** ২০২২ সাল নাগাদ বিশ্বে যে চারটি দেশ মাছ চাষে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে, তার শীর্ষে রয়েছে বাংলাদেশ। এরপরই আছে থাইল্যান্ড, ভারত ও চীনের নাম। মাছ চাষ বেড়ে যাওয়ার পাশাপাশি দেশে মাছ খাওয়ার পরিমাণও ১০ বছরে দ্বিগুণ হয়েছে, মাছ রপ্তানির পরিমাণ বেড়েছে ১৩৫ গুণ।

কৃষির উপখাত

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (FAO) হিসাবে সামুদ্রিক মাছ আহরণের দিক থেকে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪তম।*। বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে প্রায় ২৯৩ প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়। দেশি প্রায় ১৫ প্রজাতির এবং বিদেশি ১০ প্রজাতির মাছ চাষ হচ্ছে সরকারি ১৩৬ ও বেসরকারি ৮৬৮ হ্যাচারিতে। বাংলাদেশে মৎস্য ও চিংড়ি চাষির সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৪৭ লক্ষ!*2 মোট দেশজ উৎপাদনের প্রায় ২.৪৫ শতাংশ, মোট কৃষিজ আয়ের প্রায় এক-চতুর্থাংশ দেশের রপ্তানি আয়ের ১.৩০ শতাংশ এবং আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে প্রাণিজ আমিষের প্রায় ৬২.৫৮ শতাংশ যোগান দেয় মাছ। যেখানে বিশ্বে গড়ে প্রাণিজ আমিষের ২০% আসে মাছ থেকে।

কৃষির উপখাত

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মৎস্য খাতের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। উল্লেখ্য, স্বাদু পানির, অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত জলাশয়ে বা প্রাকৃতিক উৎসের মাছে বাংলাদেশ বিশ্বে দ্বিতীয়। চীন ও ভারতের পরই বাংলাদেশ। স্বাদু পানির পাখনাযুক্ত (ফিন ফিশ) মাছ বাড়ার হারে বাংলাদেশ বিশ্বে দ্বিতীয়। বিশ্বে স্বাদু পানির মাছের ১১ শতাংশ এখন বাংলাদেশে উৎপাদিত হচ্ছে যার মোট পরিমাণ প্রায় ১৩ লক্ষ টন। বদ্ধ জলাশয়ে, চাষকৃত মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে পঞ্চম, প্রাকৃতিক ও চাষের মাছ মিলিয়ে বাংলাদেশ চতুর্থ। *4 ইলিশ উৎপাদিত হয় বিশ্বের এমন ১১টি দেশের মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশেই উৎপাদন বেড়েছে। দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনের ১২.১৫ শতাংশ এবং বিশ্বের মোট উৎপাদিত ইলিশের ৮৬% বাংলাদেশের। মৎস্য বিজ্ঞানীদের মতে, ইলিশের শরীরে থাকা চর্বি বা তেল উচ্চ রক্তচাপ ও বাতের ব্যথা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে, চোখ উজ্জ্বল করে, অবসাদ দূর করে, মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা বাড়ায়। ইলিশ যত বড় হবে, তার শরীরে ফ্যাটি এসিড, ওমেগা-৩ ও চর্বির পরিমাণও আনুপাতিক হারে বাড়বে।*

কৃষির উপখাত

বাংলাদেশ সামুদ্রিক মৎস্য আহরণেও সাফল্য অর্জন করছে। এ খাতে বাংলাদেশ ১৪তম। সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে ১ম চীন, তারপর ইন্দোনেশিয়া, পেরু, রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র। * ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা এবং গুরুত্ব বিবেচনা করে জিডিপি নিরূপণের ক্ষেত্রে সরকার মৎস্য খাতকে একটি পৃথক খাত হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ইইউর দেশসমূহ, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, রাশিয়া, চীনসহ বিশ্বের ৫২টি দেশে বাংলাদেশ হতে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানি হয়ে থাকে। নেদারল্যান্ডস বাংলাদেশ হতে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের শীর্ষ আমদানিকারক দেশ। বাংলাদেশে মাছের চাষ পদ্ধতি উদ্ভাবনের ফলে এবং স্বাদুপানির সকল প্রজাতির মাছ চাষ বৃদ্ধি করা সম্ভব হলে মাছ উৎপাদন ৫০ লক্ষ টনে পৌঁছাবে।

কৃষির উপখাত

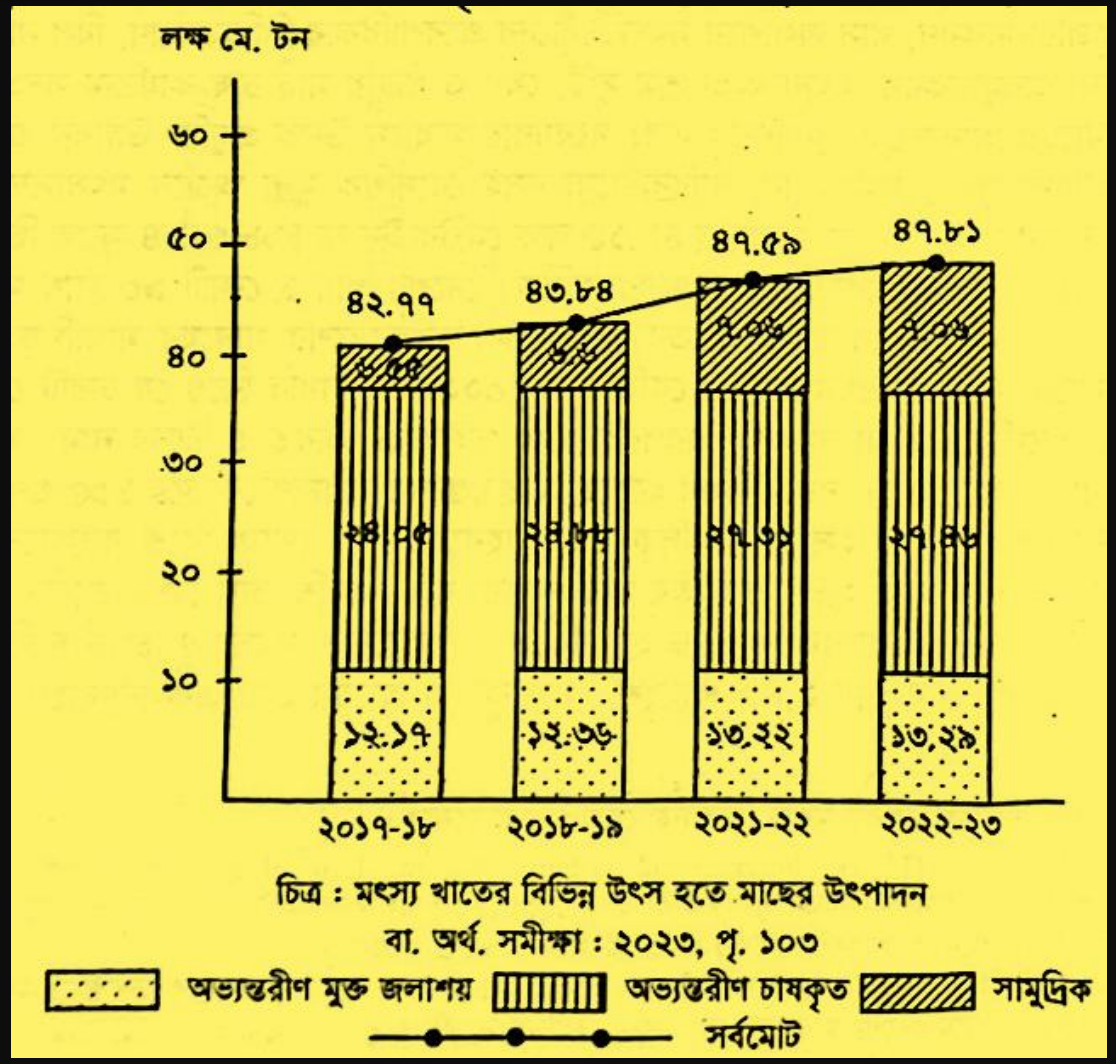

চিত্র : মৎস্য খাতের বিভিন্ন উৎস হতে মাছের উৎপাদন
বা. অর্থ. সমীক্ষা : ২০২৩, পৃ. ১০৩

কৃষির উপখাত

মৎস্য খাতে স্থির মূল্যে স্থূল দেশজ উৎপাদন (GDP) এবং GDP এর খাতওয়ারি প্রবৃদ্ধির হার :

	২০০৭–০৮	২০০৮–০৯	২০১১–১২	২০১৩–১৪	২০২২–২৩	২০২৩–২৪*
GDP (কোটি টাকায়)	১৯৬৮৫	২০৬৫৭	২৪২৭৯	২৭৪১৯	১০৯৬৪৫	১২৩৬৭৪
GDP প্রবৃদ্ধির হার	৭.০০	৪.৯৪	৫.৩২	৬.৩৬	৫.১৩	৫.০৮

উৎস : বা. অর্থ. সমীক্ষা-২০২৪ * সাময়িক

টেবিলে উল্লেখিত তথ্যসমূহকে নিম্নে লেখচিত্রে রূপ দেয়া হলো :

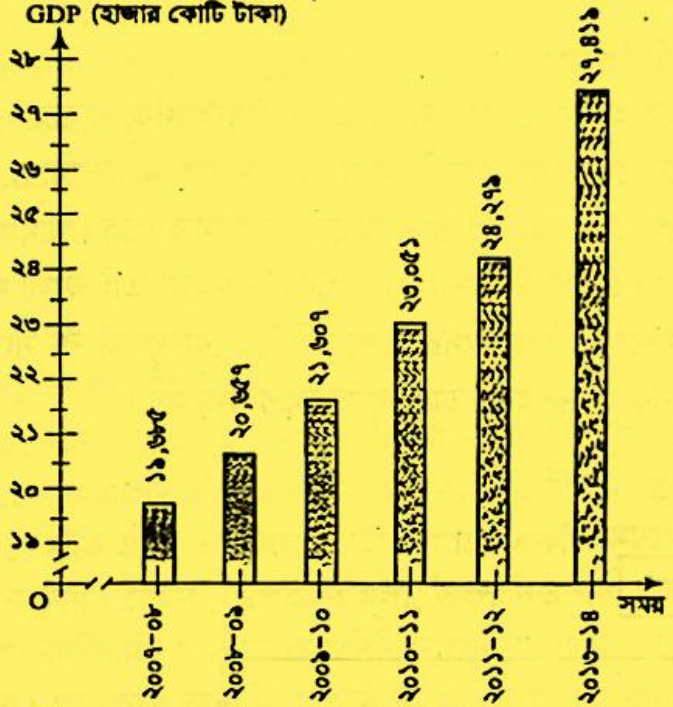

চিত্র : মৎস্য সম্পদের স্থূল দেশজ উৎপাদন (GDP)

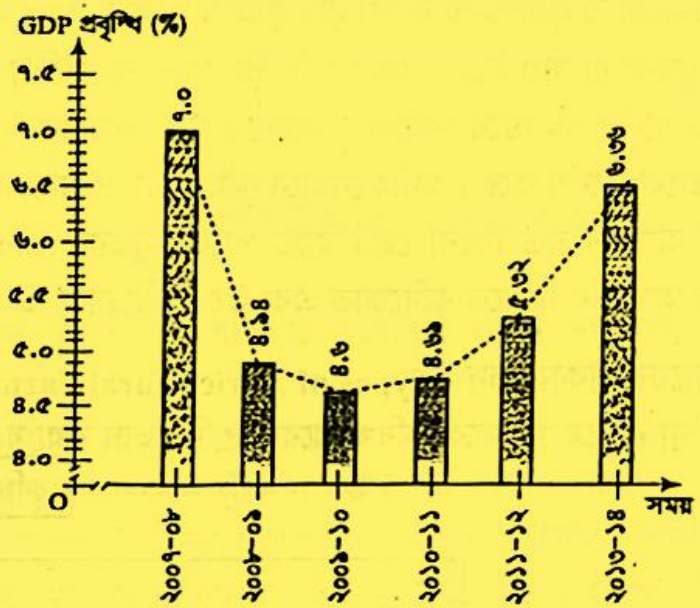

চিত্র : মৎস্য সম্পদের প্রবৃদ্ধির হার

কৃষির উপখাত

৪টি উপখাতের সমন্বয়েও লেখচিত্র অঙ্কন করা যায় :*

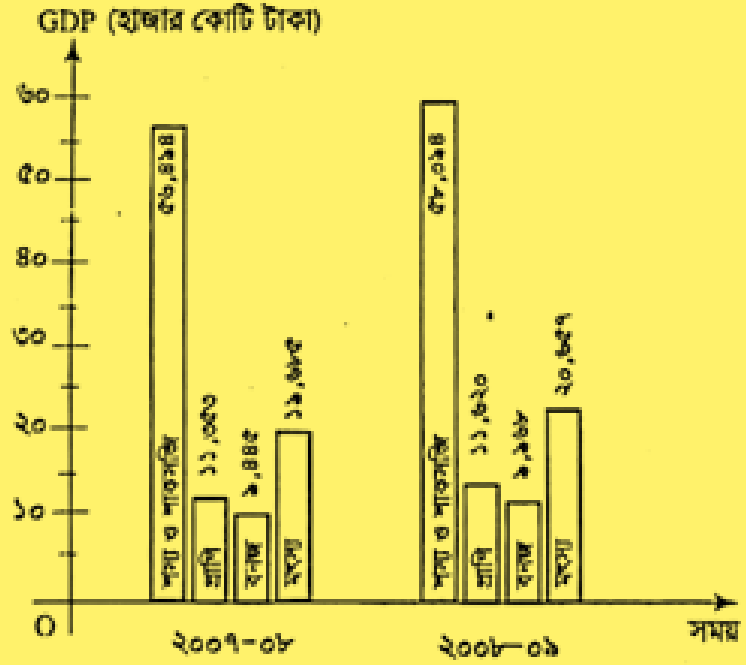

চিত্র : অবদান-সমন্বিত GDP এর লেখচিত্র

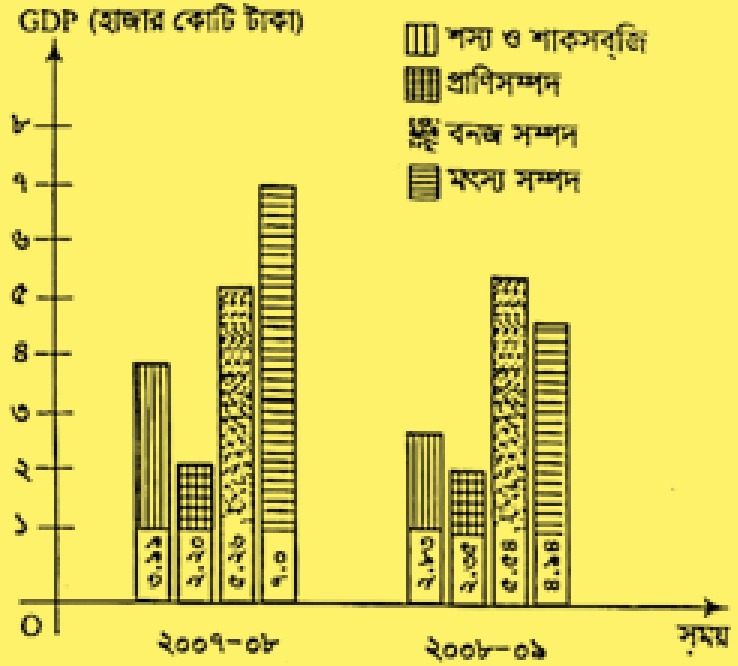

চিত্র : সমন্বিত GDP এর প্রবৃদ্ধির লেখচিত্র

কৃষির উপখাত

সারণি ও লেখচিত্র হতে বোঝা যায়, কৃষির বিভিন্ন উপখাতে বিগত দশকে প্রবৃদ্ধির হার বেশ পরিবর্তন হয়েছে। কৃষিতে বিভিন্ন উপখাতের মধ্যে শস্য ও শাকসব্জির অবদান বেশি হলেও সমন্বিত প্রবৃদ্ধিতে দেখা যায়, শস্য ও শাকসব্জি উৎপাদনে প্রবৃদ্ধির হার পূর্বাপেক্ষা হ্রাস পেয়েছে, প্রাণিসম্পদের প্রবৃদ্ধি ধীরগতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে, বনজ সম্পদের উত্থান-পতন খুব সামান্য এবং মৎস্য সম্পদের প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেয়েছে।*। এভিয়ান ফ্লুর মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রাণিসম্পদ উপখাতের প্রবৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ২য় পত্র

অধ্যায় ০২ : বাংলাদেশের কৃষি

টপিক – ০৩ কৃষিখামার ও কৃষিজোত

কৃষিখামার ও কৃষিজোত

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

কৃষিখামার ও কৃষিজোত

কৃষিখামার ও কৃষিজোত ধারণা দুটি খুবই কাছাকাছি অর্থে ব্যবহৃত হলেও উভয়ের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। কোনো একজন কৃষক বা সংগঠকের অধীনে নির্দিষ্ট স্থানে বা বিভিন্ন স্থানে যে পরিমাণ জমি কৃষি উৎপাদনের আবাদযোগ্য, তাকে কৃষিজোত বলে। পক্ষান্তরে কোনো কৃষিজোতে যখন চাষাবাদের পরিকল্পনা করা হয় তখন তাকে কৃষিখামার বলে। খামার মূলত ভূমিব্যবস্থাকে নির্দেশ করে। অর্থাৎ যেখানে কৃষি, শিল্প ও অন্যান্য সকল প্রকার উৎপাদন কাজ পরিচালিত হয়, তাই হলো খামার। খামারের আয়তন বড় কিংবা ছোট হতে পারে। সুতরাং আবাদযোগ্য বা চাষাবাদের উপযোগী কোনো কৃষক বা সংগঠনের যেকোনো আকৃতির জমিকে কৃষিজোত এবং উক্ত কৃষিজোতে উৎপাদনকার্য শুরু হলে তাকে কৃষিখামার বলা হয়।

কৃষিখামার ও কৃষিজোত

কৃষিখামারের প্রকারভেদ (Types of Agricultural Farm)

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কৃষিখামারের শ্রেণিবিভাগ করা যায়। যেমন :

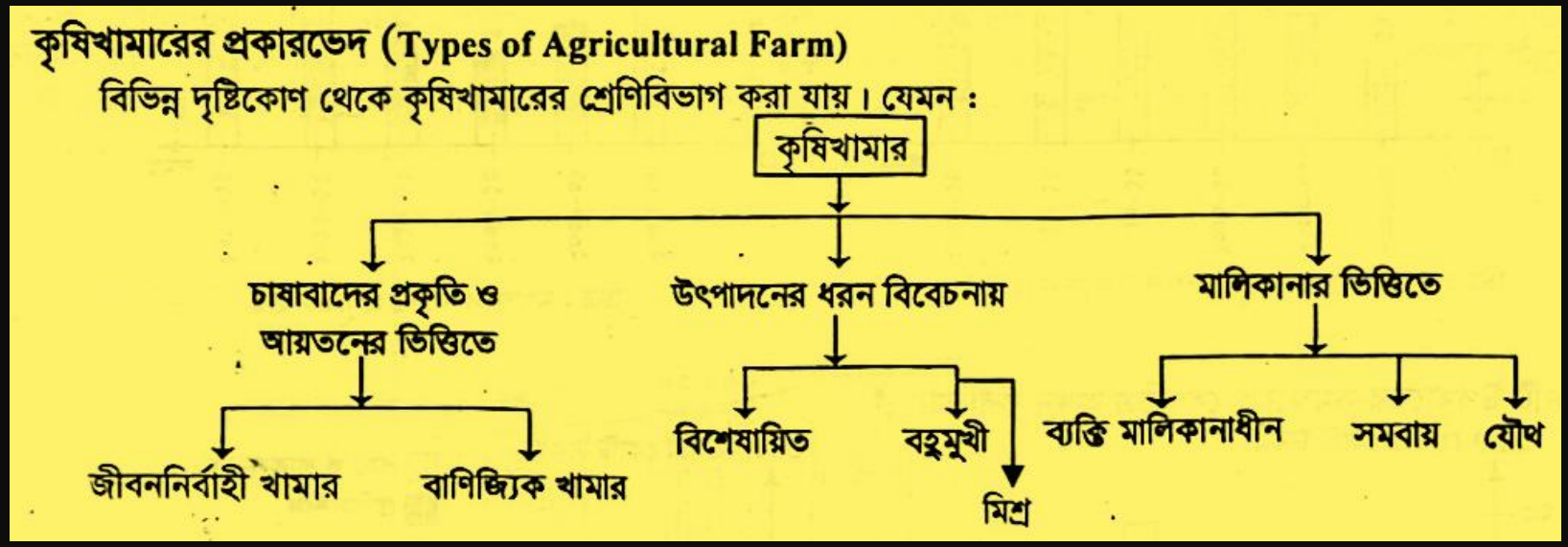

কৃষিখামার ও কৃষিজোত

চাষাবাদের প্রকৃতি ও আয়তনের দিক থেকে কৃষিখামার দু'প্রকার। যথা-

(ক) জীবননির্বাহী খামার (Subsistence Farm)

জীবননির্বাহী খামার বা আত্মতোষণ খামার বলতে বোঝায়, ক্ষুদ্র আয়তনের ভূমি যেখানে উত্তম চাষাবাদের মাধ্যমে যে ফসল উৎপাদন হয় তা দ্বারা উৎপাদনকারী কৃষক কোনো রকমভাবে জীবিকানির্বাহে সক্ষম। এ ধরনের খামারে ব্যবস্থাপনা অসংগঠিত ও পরিদর্শনব্যবস্থা অদক্ষ তাই উদ্বৃত্ত কম সৃষ্টি হয়।

(খ) বাণিজ্যিক খামার (Commercial Farm)

বাণিজ্যিক খামার বলতে বোঝায়, বৃহৎ আয়তনের ভূমি যেখানে অধিক শ্রম, পুঁজি, প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে অধিক উৎপাদন, অধিক উদ্বৃত্ত এবং অধিক মুনাফা সৃষ্টি হয়। এ ধরনের খামারে উৎপাদনকার্য পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা, তত্ত্বাবধান এবং বাজারজাতকরণে দক্ষ শ্রমবিভাগ প্রবর্তিত হয়।

কৃষিখামার ও কৃষিজোত

জীবননির্বাহী খামার ও বাণিজ্যিক খামারের মধ্যে পার্থক্য

১. খামারের আয়তন: জীবননির্বাহী খামারের আয়তন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হয় এবং অতিমাত্রায় প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল। পক্ষান্তরে বাণিজ্যিক খামারের আয়তন অপেক্ষাকৃত বৃহৎ হয় এবং প্রকৃতির ওপর কম নির্ভরশীল।

২. চাষাবাদ পদ্ধতি: জীবননির্বাহী খামারে চাষাবাদ পদ্ধতি চিরাচরিত, ব্যবস্থাপনা অসংগঠিত এবং পরিদর্শনব্যবস্থা অদক্ষ। পক্ষান্তরে বাণিজ্যিক খামারের চাষাবাদ পদ্ধতি আধুনিক, ব্যবস্থাপনা পরিকল্পিত এবং দক্ষ পরিদর্শনব্যবস্থা বিদ্যমান।

৩. দক্ষতা: জীবননির্বাহী খামারে কারিগরি কৌশল প্রয়োগ করা যায় না। তাই এটি কম দক্ষ। বাণিজ্যিক খামারে কারিগরি কৌশল প্রয়োগ করা যায়। তাই এটি অধিক দক্ষতাপূর্ণ। ৪. উৎপাদনের উদ্দেশ্য: জীবননির্বাহী খামারে পারিবারিক ভোগই একমাত্র উদ্দেশ্য। বাণিজ্যিক খামারে উৎপাদনের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বাণিজ্যিকভিত্তিক।

৫. বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা: জীবননির্বাহী খামারে বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু বাণিজ্যিক খামারে বাজারজাতকরণ ব্যবস্থায় অসংখ্য প্রতিনিধি নিয়োগ করা হয়।
৬. ঝুঁকি গ্রহণ: জীবননির্বাহী খামারে একটি মাত্র ঝুঁকি হলো প্রতিকূল আবহাওয়া। অপরদিকে, বাণিজ্যিক খামারের ঝুঁকি বহুবিধ। যেমন: উপকরণ মূল্য, উৎপাদিত পণ্য মূল্য, বাজারজাতকরণ ঝুঁকি প্রভৃতি। জীবননির্বাহী খামারে কম বিনিয়োগের মাধ্যমে, বহুবিধ ফসল উৎপাদন হলেও উপকরণের অর্থনৈতিক ব্যবহার সম্ভব হয় না। পক্ষান্তরে বাণিজ্যিক খামারে অধিক মূলধন ব্যবহারের মাধ্যমে একটি বা দুইটি দ্রব্য উৎপাদিত হলেও উপকরণের অর্থনৈতিক ব্যবহার সুনিশ্চিত হয়।

কৃষিখামার ও কৃষিজোত

উৎপাদনের ধরন বিবেচনায় কৃষিখামার তিন'প্রকার। যথা: (ক) বিশেষায়িত খামার, (খ) বহুমুখী খামার ও (গ) মিশ্র খামার।

ক. বিশেষায়িত খামার (Specialized farm): কোনো সুনির্দিষ্ট ফসল উৎপাদনে ব্যবহৃত খামারকে বিশেষায়িত খামার বলে।

খ. বহুমুখী খামার (Versatile farm): একই খামারে বিভিন্ন ধরনের ফসল চাষাবাদ করা হলে তাকে বহুমুখী কৃষিখামার বলে।

গ. মিশ্র খামার (Mixed farm): এ ধরনের খামারের এক অংশে কৃষি চাষাবাদ বা ফসল উৎপাদন করা হয় এবং অপর অংশে পশু পালন করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং ইউরোপে এ ধরনের খামারের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

কৃষিখামার ও কৃষিজোত

মালিকানার ভিত্তিতে কৃষিখামার তিন প্রকার। যথা-

(i) ব্যক্তিমালিকানাধীন খামার (Private farm): সম্পূর্ণ ব্যক্তিমালিকানায় যে খামার পরিচালিত হয়, তাকে ব্যক্তিমালিকানাধীন খামার বলে।

(ii) সমবায় খামার (Co-operative farm): কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের কৃষকরা স্বউদ্যোগে পারস্পরিক কল্যাণার্থে যে খামার পরিচালনা করেন তাকে সমবায় খামার বলে। এটি সাধারণত বৃহদায়তন আকৃতির খামার।

(iii) যৌথ খামার (Collective farm): কয়েকজন কৃষক নিজেদের জমি ও মূলধনের সমন্বয়ে যে খামার পরিচালনা করেন, তাকে যৌথ খামার বলে।

কৃষিখামার ও কৃষিজোত

আদর্শ খামার

আদর্শ খামার বলতে বোঝায় যেখানে উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের সুষ্ঠু প্রয়োগের ফলে একরপ্রতি সর্বাধিক কৃষি ফলন হয় বা সর্বাধিক কৃষি ফলনের লক্ষ্যে চাষাবাদ করা হয়।

অর্থনীতিবিদ Dyno Keatinge এ প্রসঙ্গে বলেন, প্রচলিত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে যে পরিমাণ জমিতে একটি ফার্মের একরপ্রতি সর্বাধিক উৎপাদন পাওয়া যায় এবং উৎপাদিত ফসলের আয় হতে কৃষক ও তার পরিবার সন্তোষজনকভাবে জীবিকানির্বাহ করে জীবনযাপনের সুযোগ পায়, সে পরিমাণ জমিকে আদর্শ খামার বা অর্থনৈতিক কৃষিজোত বলে।

কৃষিখামার ও কৃষিজোত প্রায়ই একই অর্থে ব্যবহার হয়। অনেকেই কৃষিজোত বলতে আদর্শ খামারকেই বুঝিয়েছেন। এর আকার-আয়তন দেশ-কাল-পাত্রভেদে ভিন্নতর হয়। যেমন যুক্তরাষ্ট্রে আদর্শ কৃষিখামারের আয়তন ১৫০ একর, চীনে ৩২৫ একর, জার্মানিতে ২১ একর, বেলজিয়ামে ১৪ একর। বাংলাদেশে সাধারণত ৩ একর জমিকে আদর্শ খামার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সুতরাং বিভিন্ন দেশে আদর্শ খামারের আয়তন বিভিন্ন রকম। এমনকি একই দেশে বিভিন্ন স্থানে আদর্শ খামারের আয়তন বিভিন্ন হতে পারে।

কৃষিখামার ও কৃষিজোত

আদর্শ খামার

আদর্শ খামারের নির্ধারকসমূহ (Determinants of an Ideal Farm)

আদর্শ খামার বা অর্থনৈতিক কৃষিজোত নিম্নোক্ত বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। যেমন-

ক. জমির আয়তন: জমির আয়তন অতি ক্ষুদ্র বা ক্ষুদ্র হলে আদর্শ খামার তৈরি করা যায় না।

খ. জমির প্রকৃতি: আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি, জমির উর্বরা শক্তি অধিক, শস্যবহুমুখীকরণের সুযোগ বিদ্যমান থাকলে আদর্শ খামারের জন্য জমির আয়তন কিছুটা ছোট হলেও চলে। কিন্তু জমিতে শস্যবহুমুখীকরণ সম্ভব না হলে এবং উর্বরা শক্তি কম হলে এবং চাষাবাদ-এর জন্য ট্রাক্টর/পাওয়ার টিলার ব্যবহারের প্রয়োজন হলে আদর্শ খামার গঠনে অধিক জমির প্রয়োজন হয়।

গ. ফসলের প্রকৃতি: ফসলের প্রকৃতির ওপরও এটি নির্ভরশীল। শাক-সব্জির ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রায়তনের জমি এবং ধান, ডাল, গম, পাট প্রভৃতির ক্ষেত্রে তুলনামূলক বৃহৎ আয়তনের জমি প্রয়োজন।

ঘ. প্রযুক্তি: আদর্শ খামার গঠনে প্রযুক্তি, যান্ত্রিক চাষাবাদ, ট্রাক্টর ইত্যাদির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

কৃষিখামার ও কৃষিজোত

আদর্শ খামার

ঙ. জলবায়ু : অনুকূল জলবায়ুতে ক্ষুদ্রায়তনের জমিতে এবং প্রতিকূল জলবায়ুতে বৃহৎ আয়তনের জমিতে এ ধরনের খামার নির্মাণ করা যায়।

অর্থাৎ প্রত্যেক দেশে কৃষিখামারের আয়তন নির্ভর করে ঐ দেশের ভৌগোলিক পরিবেশ, জমির উৎকর্ষতা, উৎপাদনের কলাকৌশল, পানিসেচব্যবস্থা ইত্যাদির ওপর। তবে বাংলাদেশে উপরোক্ত কারণগুলো ছাড়াও জনসংখ্যার চাপ, ধর্মীয় আইন, একান্নবর্তী পরিবারে ভাঙ্গন প্রভৃতির ওপর খামারের আয়তন নির্ভর করে।রাজা টং সেভারাগা

কৃষিখামার ও কৃষিজোত

আদর্শ খামার

বাংলাদেশে কৃষিখামারের স্বরূপ (Nature of Agricultural Farm in Bangladesh)

বাংলাদেশে কৃষি উৎপাদনে অদক্ষতা এবং স্বল্প উৎপাদনের জন্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মান্ধাতার আমলের উৎপাদন কলাকৌশলই দায়ী। কিন্তু অনেকেই মনে করেন, খামারের আয়তনও কৃষি উৎপাদনের অদক্ষতার জন্য অনেকাংশে দায়ী।

জরিপ: ১৯৬৯-৭০ সালে বি.আই.ডি.এস তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে (বর্তমানে বাংলাদেশ) কৃষিখামারের আয়তন সম্পর্কে একটি জরিপ চালায়। এ জরিপ কাজ ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর; ঠাকুরগাঁও, নারায়ণগঞ্জ এলাকায় যেখানে জমিতে পানি সেচের সুবিধা ছিল সেখানে চালানো হয়। জরিপের ফলাফলে দেখা যায়, ঐ সময়ে ফুলপুর এলাকায় ২২ একরের ২৬টি খামার ছিল। ২২ হতে ৫ একরের মধ্যে খামারের সংখ্যা ছিল ৩৮টি। এটাই ছিল সর্বোচ্চ সংখ্যক খামার। ১৯৬৮ সালে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাস্টার কৃষি জরিপ হতে দেখা যায়, তখন মোট খামারের মধ্যে শতকরা ৫৭ ভাগই ২২ একরের মধ্যে এবং হতে ৫ একরের মধ্যে রয়েছে শতকরা ২৬ ভাগ। ১২.৫ একর এবং এর ওপরে কৃষিখামারের সংখ্যা শতকরা প্রায় ৩ ভাগ। ফুলপুরের জরিপ হতে দেখা যায়, ঐ এলাকায় গড়পড়তা কৃষিখামারের আয়তন ৫ একরেরও কম। সমগ্র বাংলাদেশের জন্য উল্লেখিত মাস্টার জরিপ প্রমাণ করে যে, বেশির ভাগ খামারের আয়তনই ৫ একরের নিচে।

কৃষিখামার ও কৃষিজোত

আদর্শ খামার

বাংলাদেশের অধিকাংশ খামারই জীবনধারণোপযোগী খামার (Subsistence farm) যেখানে কৃষক তার পরিবারের ভরণপোষণের জন্য প্রয়োজনীয় সম্ভাব্য সকল কৃষিপণ্যই উৎপাদনের চেষ্টা করে। এসব খামার হতে কৃষকের আয় যৎসামান্য এবং সঞ্চয়ও কম হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ৭৫% ভূমি কৃষক নিজেই নিজের জমি চাষ করে, ২৫% জমি বর্গাচাষের অধীন। প্রায় ৪০% কৃষক পরিবার বর্গাচাষি এবং ৪৮% কৃষক পরিবার ভূমিহীন। মোট কৃষিজোতের শতকরা প্রায় ৮৮.৪৯ ভাগই হলো জীবনধারণোপযোগী ক্ষুদ্রায়তনের (০.০৫ – ২.৪৯ একর), মাঝারি আয়তনের জোত প্রায় ১০.৩৪ ভাগ (২.৫০ – ৭.৪৯ একর) এবং বৃহদায়তনের জোত ১.১৭ ভাগ (৭.৫০ একর)

কৃষিখামার ও কৃষিজোত

কৃষিখামারের আয়তনের সাথে কৃষি উৎপাদন দক্ষতার সম্পর্ক

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বৃহৎ আয়তনের খামারে আধুনিক প্রযুক্তির সফল প্রয়োগের ফলে অধিক উৎপাদন হয় বা উৎপাদন দক্ষতা অধিক। কিন্তু বিভিন্ন জরিপে দেখা যায়, বাংলাদেশে বড় খামারের চেয়ে ক্ষুদ্রায়তন খামারগুলোর উৎপাদন দক্ষতা এবং একরপ্রতি উৎপাদন অপেক্ষাকৃত বেশি। এর কারণ হলো:

(i) কৃষকরা নিজস্ব জমিতে যত মনযোগ দিয়ে চাষাবাদ করে, অন্যের জমিতে ততটা মনযোগসহকারে কাজ করে না।

(ii) বাংলাদেশের কৃষিখাতে প্রচুর উদ্বৃত্ত শ্রমিক আছে, একারণে শ্রমের সুযোগ ব্যয় অত্যন্ত কম। ক্ষুদ্রায়তনবিশিষ্ট খামারগুলো পারিবারিক শ্রমের ওপর নির্ভরশীল। এরূপ শ্রমের আধিক্য রয়েছে এবং পরিবারের বাইরে কর্মসংস্থানের সুযোগ কম থাকায় প্রতিটি পরিবার শ্রমের প্রান্তিক দক্ষতা ধনাত্মক থাকা পর্যন্ত উহা ব্যবহার করে। ফলে একরপ্রতি উৎপাদন বেশি হয়।

কৃষিখামার ও কৃষিজোত

কৃষিখামারের আয়তনের সাথে কৃষি উৎপাদন দক্ষতার সম্পর্ক

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেট বুক-২০১০ এর তথ্যানুসারে :

খামারের আয়তন	শতকরা হার	গড় আয়তন
ক্ষুদ্রায়তন	৮৮.৪৯	
০.৫০–০.৯৯ একর	৬২.৫৫	০.৯৭
১.০০–১.৪৯ একর	১৩.৬৩	১.৫০
১.৫০–২.৪৯ একর	১২.৩১	২.২৬
মাঝারি ২.৫০–৭.৪৯	১০.৩৪	৪.৩২
বৃহদায়তন ৭.৫০ একর +	১.১৭	১২.৭৪

কৃষিখামার ও কৃষিজোত

কৃষিখামারের আয়তনের সাথে কৃষি উৎপাদন দক্ষতার সম্পর্ক

খামারের আকার (একর)	উপকরণের প্রান্তিক উৎপাদন দক্ষতা		
	জমি (একরপ্রতি)	শ্রম (প্রতি মনুষ্য দিন)	মূলধন (প্রতি টাকায়)
০–২.৪৯	৪১.০২	৫.১২	৩.৩১
২.৫–৪.৯৯	৮৫.০১	৩.৯৩	৫.৩১
৫.০–৭.৪৯	৪৫.৯৬	৫.৬০	২.২১
৭.৫–উর্ধ্বে	৬২.৮৭	৩.৮৮	৩.২৭
সমস্ত খামার	৫৮.৪৬	৪.৫৯	৩.৮১

উৎস : Hossain Mahbub 'Farm size and Productivity in Bangladesh Agriculture' A Case study of Phulpur farms in BER, January, 1974.

কৃষিখামার ও কৃষিজোত

কৃষিখামারের আয়তনের সাথে কৃষি উৎপাদন দক্ষতার সম্পর্ক

উপকরণসমূহের সামগ্রিক উৎপাদনক্ষমতা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ক্ষুদ্র অথচ মোটামুটি আয়তনবিশিষ্ট খামারের দক্ষতা অধিক। গবেষণালব্ধ ফলাফলে আরও লক্ষ্য করা যায়, বাংলাদেশে ক্ষুদ্রায়তন খামার শুধুমাত্র ভূমি ব্যবহারের দিক হতেই দক্ষ নয়, অন্যান্য সম্পদের ব্যবহারের দিক হতেও দক্ষ। FAO এর তথ্য অনুযায়ী বিশ্বে যেখানে গড় উৎপাদনশীলতা হেক্টরপ্রতি প্রায় তিন টন, বাংলাদেশে তা ৪.১৫ টন। দুই যুগ আগেও দেশের অর্ধেক এলাকায় একটি ও বাকি এলাকায় দুটি ফসল হতো। বর্তমানে দেশে বছরে গড়ে দুটি ফসল হচ্ছে। সরকারের যুগোপযোগী পরিকল্পনা, পরিশ্রমী কৃষক এবং মেধাবী কৃষিবিজ্ঞানী ও সম্প্রসারণবিদদের যৌথ প্রয়াসেই এ সাফল্য। খাদ্য উৎপাদনে নীরব বিপ্লব বাংলাদেশকে বিশ্বমঞ্চে ঈর্ষণীয় পর্যায়ে উন্নীত করেছে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ২য় পত্র

অধ্যায় ০২ : বাংলাদেশের কৃষি

টপিক – ০৪ কৃষিপণ্যের বিপণন

কৃষিপণ্যের বিপণন

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

কৃষিপণ্যের বিপণন

কৃষিপণ্যের বিপণন বলতে কৃষিপণ্যের ক্রয়-বিক্রয় বা বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাকে বোঝায়। এ ব্যবস্থার মধ্যে বিভিন্ন কার্যাবলি হলো পরিকল্পনা প্রণয়ন, অর্থযোগান, গুদামজাতকরণ, উৎপাদন, পরিবহণ, 'ঝুঁকি গ্রহণ, মানোন্নয়ন, বাজার সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, বিজ্ঞাপন, প্যাকেটকরণ এবং বিক্রয় প্রভৃতি নির্দেশ করে।

মি. আর. এল. কোহলস্ (R. L Kohls)-এর মতে, "বাজারজাতকরণ হচ্ছে এরূপ এক ধরনের ব্যবসায়িক কার্যকলাপ যার মাধ্যমে পণ্যদ্রব্য ও সেবার প্রবাহ উৎপাদনকারীর নিকট থেকে কোনো নির্দিষ্ট সময় এবং স্থানে, তার পছন্দমতো আকারে সে পরিশোধ করতে রাজি থাকে এমন একটি দামে ভোক্তার নিকট পৌঁছান হয়।""

অর্থনীতিবিদ হ্যানসেনের (Hansen) সংজ্ঞা দ্বারা বাজারজাতকরণের সর্বশেষ মতামত টানা যায়। তাঁর মতে, "বাজারজাতকরণ এরূপ একটি কার্যক্রম যা ভোক্তাদের চাহিদা ও প্রয়োজন আবিষ্কার করে, সে অনুসারে পণ্য অথবা সেবা উৎপন্ন করে এবং যা চাহিদা সৃষ্টি ও চাহিদা বৃদ্ধির কাজে ব্যাপৃত।"

কৃষিপণ্যের বিপণন

কৃষিপণ্য বিপণনের উদ্দেশ্য (Aim in marketing of Agricultural Product) হলো: (ক) উৎপাদন বৃদ্ধি, (খ) বণ্টন ব্যবস্থার উন্নয়ন, (গ) ভোগ বৃদ্ধি এবং (ঘ) প্রচুর দক্ষ ও অদক্ষ জনশক্তির কর্মসংস্থান।

বাংলাদেশে কৃষিপণ্য বিপণনের সাথে জড়িত বিভিন্ন কার্যক্রম হলো: (i) তথ্য সংগ্রহ, (ii) ঝুঁকি গ্রহণ, (iii) অর্থায়ন, (iv) চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন, (v) শ্রেণিবিন্যাস, (vi) গুদামজাতকরণ, (vii) পরিবহণ, (viii) বাজার অনুসন্ধান, (ix) ক্রয়-বিক্রয় প্রভৃতি।

কৃষিপণ্যের বাজার কাঠামো তিন প্রকার। যথা- (i) কৃষিখামারের কাছাকাছি স্থানে-প্রাথমিক বাজার, (ii) আড়ত বা পাইকারি ব্যবসায়ীদের-মাধ্যমিক বাজার এবং (iii) ভোক্তাদের জন্য খুচরা বিক্রেতাদের বাজার।

কৃষিপণ্যের বিপণন

বাংলাদেশে কৃষিজাতপণ্য বিপণনের সমস্যাবলি

বাংলাদেশের কৃষিজাত পণ্যের বিপণনব্যবস্থা খুব উন্নত নয়। ফলে কৃষক, তাদের উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী তথা ফসল বিক্রি করে ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হয়। বাংলাদেশে কৃষিজাতপণ্য বিপণনের সমস্যা বা ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির সমস্যাসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১. কৃষকের দারিদ্র্য: বাংলাদেশের কৃষকরা অত্যন্ত দরিদ্র। এ দারিদ্র্যের কারণে কৃষকরা ফসল ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে ফসল ওঠার আগেই নামমাত্র মূল্যে তা বিক্রয় করে দিতে বাধ্য হয়।

২. অনুন্নত পরিবহণ ও যোগাযোগব্যবস্থা: আমাদের দেশে পরিবহণ ও যোগাযোগব্যবস্থা অনুন্নত। ফলে দরিদ্র কৃষকের জন্য এটি অত্যন্ত শ্রমসাধ্য ও ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে, যা বহন করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

৩. অপ্রতুল বাজার সুবিধা: কৃষিজাতপণ্য বেশিরভাগই গ্রামীণ প্রাথমিক বাজারে কেনা-বেচা হয়। এ বাজারে ভৌত অবকাঠামো খুবই দুর্বল, তাছাড়া টোল ও চাঁদা দেওয়ার কারণে কৃষকরা পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের নিট দাম কম পায়।

৪. গুদামজাতকরণ ও সংরক্ষণের অসুবিধা: ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, বিত্তশালী ব্যবসায়ী এমনকি রাষ্ট্রীয়ভাবেও কৃষিজাতপণ্য সংরক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে গুদামঘরের অভাব রয়েছে। এরূপ সংরক্ষণের অসুবিধার কারণে অনেক উদ্বৃত্ত ফসল নষ্ট হয়। ফলে কৃষকরা ফসলের মৌসুমেই কম দামে ফসল বিক্রি করে ফেলতে বাধ্য হয়।

কৃষিপণ্যের বিপণন

বাংলাদেশে কৃষিজাতপণ্য বিপণনের সমস্যাবলি

ত্রুটিপূর্ণ ওজন ও পরিমাপ: বাংলাদেশের সর্বত্র ত্রুটিপূর্ণ ওজন ও পরিমাপ ব্যবহার করা হয়। এর ফলে কৃষকরা প্রতারিত হয়।

৫. ৬. দুর্বল বাজার কাঠামো: বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের বাজারগুলো সুসংঘটিত ও সুনিয়ন্ত্রিত নয়। মৌসুমের সময় কৃষকের নিকট থেকে মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীরা ফসলের মূল্যের একটি মোটা অংশ কর, খাজনা, আড়তদারি, চাঁদা ইত্যাদির নামে কেটে রাখে।

৭. বিপণন ঋণের অভাব: বিপণনের বিভিন্ন পর্যায়ে যেমন-সংরক্ষণ, পরিবহণ, প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে অর্থের প্রয়োজন হয়। কিন্তু কৃষকের জন্য এরূপ ঋণের ব্যবস্থা নেই কিংবা থাকলেও তা খুবই অপ্রতুল।

৮. শিক্ষার অভাব : আমাদের দেশের কৃষকরা কম শিক্ষিত বা অশিক্ষিত। ফলে ফটকা কারবারের জটিলতা ও বৈদেশিক বাজারের গতিপ্রকৃতির সঙ্গে তারা একেবারেই অপরিচিত। অশিক্ষিত কৃষক পণ্যের তথ্য সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে।

কৃষিপণ্যের বিপণন

বাংলাদেশে কৃষিজাতপণ্য বিপণনের সমস্যাবলি

৯. পণ্যের মান নির্ধারণে জটিলতা: দেশের সকল স্থানে উৎপাদিত কৃষিপণ্যের মান একরূপ নয়। ফলে কৃষিপণ্যের মান নির্ধারণের বিষয়টি কৃষিবাজারে এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি করে।

১০. বাজার তথ্যের অভাব: কৃষিপণ্যের দামের তথ্য রেডিও এবং খবরের কাগজের মাধ্যমে প্রচারিত হয়। কিন্তু অনেক কৃষক এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত। অবশ্য বড় ব্যবসায়ীরা টেলিফোনের মাধ্যমে অতি সহজে দেশের বিভিন্ন স্থানে পণ্যের দামের তথ্য সংগ্রহ করতে পারে।

১১. দামের উত্থান-পতন: বাংলাদেশে কৃষিপণ্যের দামের তীব্র ওঠানামা হয়। মৌসুমের সময় দাম কম এবং যখন কৃষকের ঘরে আর ফসল থাকে না, তখন দাম বাড়ে। দামের এরূপ উত্থান-পতনের কারণে কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

১২. সরকারি নীতির অভাব: বাংলাদেশের কৃষিপণ্যের বাজার সংগঠিত ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারের সুনির্দিষ্ট কোনো নীতিমালা নেই।

১৩. প্রতিযোগিতার অভাব: সুষ্ঠু ও প্রতিযোগিতামূলক বাজারব্যবস্থার অভাবে কৃষিপণ্য বিভিন্ন বাজারে বিভিন্ন দামে বিক্রি হওয়ার ফলে কৃষক ফসলের উপযুক্ত মূল্য পায় না।

কৃষিপণ্যের বিপণন

বাংলাদেশে কৃষিজাতপণ্য বিপণনের সমস্যাবলি

১৪. শ্রেণিবিন্যাস ও নমুনাকরণের অভাব: কৃষিপণ্যের গুণানুসারে নমুনাকরণের সুবন্দোবস্ত না থাকার কারণে নিকৃষ্ট ও উৎকৃষ্ট পণ্য প্রায় একই দামে বিক্রি হয়। ফলে কৃষক ভালো পণ্যের ভালো দাম পায় না।

১৫. লক-ডাউন ও যুদ্ধ পরিস্থিতি: কোভিড-১৯ এর সময় সমগ্র বিশ্বেই বিভিন্ন দেশকে 'লক-ডাউন' দিতে হয়েছিল। এরূপ পরিস্থিতিতেও কৃষিপণ্যের বিপণন বাধাপ্রাপ্ত হয়। ২০২২ সালে ইউক্রেন ও রাশিয়া যুদ্ধের ফলে ইউক্রেনে উৎপাদিত খাদ্যশস্য পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে অবাধে প্রেরণ করা সম্ভব হয়নি। ফলে সমগ্র বিশ্বে খাদ্যপণ্যের দাম দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

বাংলাদেশের কৃষিপণ্যের বিপণনব্যবস্থায় উপরিউক্ত ত্রুটিসমূহ পরিলক্ষিত হয়। ফলে কৃষকরা ফসলের ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং এদের অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাহত হচ্ছে।

কৃষিপণ্যের বিপণন

বাংলাদেশে কৃষিজাতপণ্য বিপণনের সমস্যাবলি সমাধানের উপায়

বাংলাদেশে কৃষিজাত পণ্যের বিপণন সমস্যার সমাধানের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়-

১. পরিবহণ ও যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন: গ্রামের প্রাথমিক বাজার, সমাবেশ বাজার ও মাধ্যমিক বাজারের ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন সাধন করতে হবে যাতে বাজারসমূহ পরস্পরের সঙ্গে এবং উৎপাদন এলাকার সঙ্গে যুক্ত করার মাধ্যমে কৃষকের পণ্য বাজারজাতকরণে সুবিধা হয়।

২. পর্যাপ্ত ঋণ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ: স্বল্পসুদে ঋণদানের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ঋণদান সংস্থা গ্রামাঞ্চলে স্থাপন করতে হবে যাতে কৃষকের প্রয়োজনের সময় পর্যাপ্ত ঋণ সরবরাহ করা সম্ভব হয়।

৩. দালাল ও ফড়িয়ার বিলোপ সাধন: কৃষিপণ্যের বাজার থেকে দালাল ও মধ্যবর্তী ফড়িয়াদের বিলোপ সাধন করতে হবে। উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ ও সমবায় সমিতি স্থাপনের মাধ্যমে এদের কার্যকলাপ বন্ধ করতে হবে।

৪. গুদাম ও ঋণ সরবরাহ: শস্য সংরক্ষণের সময় শস্যের যেন ক্ষতি না হয়, এজন্য সরকারকে গুদামঘর নির্মাণ করতে হবে এবং শস্য গুদামে মজুদ রাখার বিপরীতে সরকার ঋণ দিতে পারে।

৫. শ্রেণিবিন্যাস ও নমুনাকরণ: কৃষিপণ্যের মান অনুসারে এদের শ্রেণিবিন্যাস করতে হবে, যাতে কৃষক ভালো ফসলের জন্য ভালো দাম পায়। এর সাহায্যে বিদেশেও আমাদের কৃষিপণ্যের বাজার বিস্তৃত হবে।

কৃষিপণ্যের বিপণন

বাংলাদেশে কৃষিজাতপণ্য বিপণনের সমস্যাবলি সমাধানের উপায়

৬. বাজার নিয়ন্ত্রণ : বিভিন্ন বাজারে কৃষকদের নিকট থেকে যাতে আড়তদারি, পাল্লাদারি, টোল, চাঁদা প্রভৃতির অজুহাতে অর্থ আদায় করতে না পারে, সেজন্য আমাদের গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন বাজারগুলো সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার।

৭. সুষ্ঠু ওজন ও পরিমাপের ব্যবস্থা: দেশের সকল অঞ্চলে একই মাপের ওজনব্যবস্থা প্রচলন করতে হবে। এর ফলে ফড়িয়া ও দালালগণ কৃষকদেরকে ঠকাতে পারবে না।

৮. পণ্যমূল্য নির্ধারণ করা: সরকার কর্তৃক কৃষিপণ্যের সর্বনিম্নমূল্য ধার্য করে সেটি যাতে কার্যকর হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এতে কৃষকগণ লাভবান হয়।

৯. সমবায় বাজার গঠন: দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সমবায় সমিতির মাধ্যমে সুষ্ঠু বাজারব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, যাতে কৃষকগণ ফসলের ন্যায্যমূল্য পায়।

১০. ক্রয় এজেন্সি: ন্যায্যমূল্যে কৃষকদের নিকট থেকে ফসল ক্রয় করার উদ্দেশ্যে সরকারকে পর্যাপ্ত সংখ্যক ক্রয় এজেন্সি গঠন করতে হবে।

কৃষিপণ্যের বিপণন

বাংলাদেশে কৃষিজাতপণ্য বিপণনের সমস্যাবলি সমাধানের উপায়

১১. প্রচারণা: বাজারব্যবস্থা সম্পর্কে কৃষকদেরকে অবহিত করার জন্য সরকারি উদ্যোগে উপযুক্ত প্রচারণার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

১২ . উন্নতমানের পণ্য উৎপাদন: কৃষিজাতপণ্যের ন্যায্যমূল্যের নিশ্চয়তা বিধান করতে হলে পণ্যের মান উন্নত করতে হবে।

১৩. চুক্তিমাফিক উৎপাদন: বাংলাদেশে তামাক উৎপাদনের ক্ষেত্রে চুক্তিমাফিক উৎপাদনব্যবস্থা চালু আছে। উৎপাদক তার ফসল কোম্পানির ক্রয়কেন্দ্রে নির্ধারিত মূল্যে বিক্রয় করে এবং উপকরণের দাম রাদ দিয়ে যে মূল্য হয় তা পায়।

১৪. আন্তর্জাতিক বাজার: আমাদের কৃষিপণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের জন্য এরূপ বাজার খুঁজে বের করতে হবে।

ওপরের ব্যবস্থাদি সঠিকভাবে গৃহীত হলে কৃষিজাতপণ্যের বিপণনব্যবস্থা. উন্নত হবে এবং কৃষকরা উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য লাভ করবে। এর ফলে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে।

কৃষিপণ্যের বিপণন

কৃষিপণ্য বিপণনে সরকার/রাষ্ট্রের অংশগ্রহণ/উদ্যোগ

সরকার কর্তৃক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষিপণ্য উৎপাদনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান এবং দেশের অভ্যন্তরে বা বিদেশে এ পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্যোগকে রাষ্ট্রীয় বিপণন বলে। পৃথিবীর অনেক দেশেই কৃষকদের অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুতকরণে রাষ্ট্র কৃষিপণ্য উৎপাদন ও বিপণনে সরাসরি অথবা পরোক্ষভাবে সমর্থনসূচক নানা উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে। বাংলাদেশ সরকারও এদেশের কৃষিপণ্য বিপণন সমস্যা সমাধানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা প্রদান করে যাচ্ছে। যেমন-

(i) অবকাঠামো উন্নয়ন: আশার কথা হলো, কৃষক যাতে তার উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য পায় সেজন্য বাজারজাতকরণের নিমিত্তে সারাদেশে সরকারি উদ্যোগে 'কৃষক বিপণন দল' (Farmers Marketing Group) 'কৃষক ক্লাব' গঠনের পাশাপাশি, কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র, জেলা-উপজেলা পর্যায়ে কৃষিবাজার উন্নয়ন এবং লিংকেজ তৈরির জন্য ঢাকাতে একটি সেন্ট্রাল মার্কেট নির্মাণ কাজ (গাবতলীতে) সম্পন্ন হয়েছে।

কৃষিপণ্যের বিপণন

কৃষিপণ্য বিপণনে সরকার/রাষ্ট্রের অংশগ্রহণ/উদ্যোগ

(ii) উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি: উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষক পর্যায়ে মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, পতিত জমিকে আবাদি জমিতে রূপান্তরিতকরণ, আমদানিকৃত বীজের রোগ-বালাই পরীক্ষাগার স্থাপন, শস্য সংগ্রহোত্তর ফসলের ক্ষতি কমানোর কার্যক্রম সম্প্রসারণ, কৃষি উপকরণে ভর্তুকি বৃদ্ধি, ন্যায্যমূল্যে কৃষি উপকরণ সহজলভ্য করা ও এর সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, কৃষিঋণের আওতা বৃদ্ধি এবং প্রাপ্তি সহজীকরণ, সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ ও সেচ যন্ত্রপাতির সহজলভ্যতা বৃদ্ধি, লক্ষ্যভিত্তিক কৃষি সম্প্রসারণ, কৃষিজাতপণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, ফসল সংরক্ষণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

কৃষিপণ্যের বিপণন

কৃষিপণ্য বিপণনে সরকার/রাষ্ট্রের অংশগ্রহণ/উদ্যোগ

(iii) কৃষিপণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ: কৃষিপণ্য বিপণন নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে কৃষিপণ্যের মান যেন উচ্চ থাকে সরকার এরূপ নীতি অনুসরণ করে। এর ফলে কৃষিপণ্যের ভালো দাম পাওয়া যায় এবং দেশীয় পণ্যের ব্র্যান্ডিং (সুনাম) তৈরি হয়।

(iv) কৃষিবিমা প্রচলন: বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকদের উৎপাদিত শস্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে নষ্ট হওয়ার কারণে তাদেরকে শস্যমূল্য সহায়তার জন্য কৃষিবিমা এবং কৃষক পর্যায়ে কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্যও বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

(v) উপকরণ সহায়তা ও ভর্তুকি: সরকার সারাদেশে ২ কোটি ১০ লক্ষ কৃষক পরিবারের মধ্যে উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ করেছে। কৃষক ও ক্রেতাকে সহায়তার লক্ষ্যে অনেক সময় সরকার উচ্চ মূল্যে খাদ্যশস্য ক্রয় করে স্বল্পমূল্যে তথা ভর্তুকি দিয়ে বিক্রি করে।

কৃষিপণ্যের বিপণন

কৃষিপণ্য বিপণনে সরকার/রাষ্ট্রের অংশগ্রহণ/উদ্যোগ

(vi) কৃষিমূল্য কমিশন : ভারতসহ পৃথিবীর উন্নত ও উন্নয়নশীল অনেক দেশে কৃষিবান্ধব 'কৃষিমূল্য কমিশন' রয়েছে। ২০০৪ ও ২০০৮ সালে যথাক্রমে ধান ও ভুট্টার দামকে সহায়তা দেয়ার জন্য চীন সরকার 'মূল্য সহায়তা কার্যক্রম' চালু করে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও তবুও কৃষি তুলনামূলকভাবে অলাভজনক ব্যবসা হিসেবে বিবেচিত, কৃষক ন্যায্যমূল্য পায় না। উৎপাদিত কৃষিদ্রব্যের সঠিক মূল্য নির্ধারণের জন্য 'মূল্য নির্ধারণ কমিশন' গঠনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

জানুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত দেশে খাদ্য গুদামসমূহের মোট ধারণক্ষমতার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২২.৭৬ লক্ষ মেট্রিক টন যা নিকট ভবিষ্যতে ৩০ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত করার লক্ষ্যে সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

(vii) কৃষক বন্ধু ডাক সেবা: লকডাউনে প্রান্তিক কৃষকদের উৎপাদিত কৃষিপণ্য রাজধানী ঢাকার পাইকারি বাজারে বিনা মাশুলে পৌঁছে দিতে 'কৃষক বন্ধু ডাক সেবা' নামে একটি সার্ভিস চালু করেছে ডাক অধিদপ্তর। এ সেবার আওতায় ডিজিটাল প্লাটফর্মের মাধ্যমে কৃষক ঘরে বসেই তার বিক্রয়লব্ধ পণ্যের টাকা পেয়ে যাবেন। এর ফলে কোনো মধ্যস্বত্বভোগী ছাড়াই কৃষক তার উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য পাবেন।

কৃষিপণ্যের বিপণন

কৃষিপণ্য বিপণনে সরকার/রাষ্ট্রের অংশগ্রহণ/উদ্যোগ

বাংলাদেশ সরকারের কৃষি বিপণন নীতি

Agricultural marketing policy of the Government of Bangladesh

ভিশন: উৎপাদক, বিক্রেতা ও ভোক্তা সহায়ক কৃষি বিপণনব্যবস্থা এবং কৃষিব্যবসা উন্নয়ন।

মিশন: ১. কৃষিপণ্যের চাহিদা ও যোগান নিরূপণ, মজুদ ও দাম পরিস্থিতি বিশ্লেষণপূর্বক অত্যাবশ্যকীয় কৃষিপণ্যের দামের আগাম প্রক্ষেপণ ও এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ এবং প্রচার করা।

২. বাজার অবকাঠামো জোরদারকরণ এবং কৃষিপণ্যের সরবরাহ ব্যবস্থাপনায় সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ বাজারব্যবস্থা গড়ে তোলা।

৩. আধুনিক সুবিধা সম্বলিত বাজার অবকাঠামো নির্মাণ।

৪. গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্যের গুণগতমান পর্যবেক্ষণ, মান নির্ধারণ ও বিপণন সেবা প্রদানে সহায়তা করা। ৫. কৃষক বিপণন দল গঠন এবং উৎপাদক ও বিক্রেতার সাথে ভোক্তার সংযোগ স্থাপনে সহায়তা দান।

কৃষিপণ্যের বিপণন

কৃষিপণ্য বিপণনে সরকার/রাষ্ট্রের অংশগ্রহণ/উদ্যোগ

৬. কৃষি ব্যবসা ও কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।

৭. কৃষক ও ব্যবসায়ীদের কৃষিপণ্যের গ্রেডিং, সর্টিং, প্যাকেজিং, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ঋণ ও বিপণন সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজন কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।

সরকার সুষ্ঠুভাবে কৃষিপণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে 'কৃষি মূল্য কমিশন' (Agriculture Price Commission : APC) নামে প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছে। সরকার 'কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮' এর দেয়া ক্ষমতাবলে 'কৃষি বিপণন বিধিমালা ২০২১' বাস্তবায়ন করছে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ২য় পত্র

অধ্যায় ০২ : বাংলাদেশের কৃষি

টপিক – ০৫ কৃষিখাতে পরিবর্তনের ধারা

কৃষিখাতে পরিবর্তনের ধারা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

কৃষিখাতে পরিবর্তনের ধারা

বাংলাদেশে কৃষিখাতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। স্বাধীনতার পর কৃষি উৎপাদনযোগ্য ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়নি অথচ প্রতি মুহূর্তে বৃদ্ধি পাচ্ছে খাদ্যগ্রহণকারীর সংখ্যা। বিদ্যমান কৃষিভূমিতে বসতবাড়ি নির্মাণ এবং নগরায়ণের ফলে কৃষি উৎপাদনযোগ্য ভূমির পরিমাণ ব্যাপকভাবে হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও কৃষি উৎপাদনে বাংলাদেশের সফলতা ঈর্ষণীয়।

১. শস্য উৎপাদন: বাংলাদেশে উৎপন্ন শস্যসমূহকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা হয়। যথা- (i) খাদ্যশস্য এবং (ii) অর্থকরী শস্য। খাদ্যশস্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-ধান, গম, ভুট্টা, আলু, ডাল, তৈলবীজ, মসলা, ফলমূল, শাক-সবজি ইত্যাদি। পক্ষান্তরে অর্থকরী শস্য হলো-পাট, তুলা, রাবার চা, আখ, তামাক, রেশম প্রভৃতি। নব্বই দশকের প্রারম্ভে ১৯৮০/৮১ সালে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন ছিল ১৪৯.৭ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন হয়েছিল ৪৬৭.০৪ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫১৩.৪৫ লক্ষ মেট্রিক টন। সনাতনী বীজ, সার, সেচ ও চাষাবাদের পরিবর্তে বর্তমানে উদ্ভাবিত নতুন নতুন জাতের উফশি বীজের ব্যাপক ব্যবহার, পাওয়ার টিলার, ট্রাক্টরবাহিত লাঙল, শস্য মাড়াই যন্ত্র, রাসায়নিক সার ও কীটনাশক, যন্ত্রনির্ভর পানি সেচব্যবস্থা, শস্যবহুমুখীকরণ, নিবিড় চাষাবাদের মাত্রা ও আওতা বৃদ্ধি, পতিত জমিতে সব্জি চাষ ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। শস্য উৎপাদনের পরিবর্তনের ধারা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

কৃষিখাতে পরিবর্তনের ধারা

খাদ্যশস্য উৎপাদন* (লক্ষ মেট্রিক টন)

খাদ্যশস্য	১৯৮০–৮১	২০০৪–০৫	২০০৮–০৯	২০২২–২৩	২০২৩–২৪*
আউশ	৩২.৯	১৫.০	১৮.৯৫	২৯.০১	৩৯.৭৭
আমন	৭৯.৬	৯৮.২০	১১৬.১৩	১৫৪.৩৩	১৭১.৭৯
বোরো	২৬.৩	১৩৮.৩৭	১৭৮.০৯	২০৭.৬৭	২২২.৬৫
মোট চাল	১৩৮.৮	২৫১.৫৭	৩১৩.১৭	৩৯১.০২	৪৩৪.২২
গম	১০.৯	৯.৭৬	৮.৪৯	১১.৭১	১২.২৯
ভুট্টা		৩.৫৬	৭.৩০	৬৪.৩২	৬৬.৯৫
মোট	১৪৯.৭	২৬৪.৮৯	৩২৮.৯৬	৪৬৭.০৪	৫১৩.৪৫

সূত্র : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই), কৃষি মন্ত্রণালয়। * লক্ষ্যমাত্রা

সূচি থেকে দেখা যায়, খাদ্যশস্যের মধ্যে আউশ ধানের উৎপাদন তেমন বৃদ্ধি পায়নি। কিন্তু আমন এবং বোরো ধানের উৎপাদনে ব্যাপক সাফল্য অর্জিত হয়েছে। যদিও বাংলাদেশে প্রকট খাদ্য সমস্যা বিদ্যমান আবাসন বা বসতবাড়ি এবং নগরায়নের কারণে প্রতি বছরই ব্যাপকভাবে কৃষিজমি হ্রাস পাচ্ছে।

কৃষিখাতে পরিবর্তনের ধারা

বাংলাদেশে উৎপাদিত শস্যসমূহের যেমন: গম, ভুট্টা, পাট, চা, আলু, ইক্ষু এর উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলছে। এছাড়া শস্যবহুমুখীকরণ কার্যক্রমের আওতায় ডাল, তৈলবীজ, আলু, ভুট্টা, মশলা ও শাক-সব্জির উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

সব্জি উৎপাদনে বাংলাদেশ গত এক যুগে বিপ্লব ঘটিয়েছে। দেশে এখন ৬০ ধরনের ২০০ জাতের সব্জি উৎপাদন হচ্ছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলে কৃষকরা সারা বছর চাষ করছে বিভিন্ন জাতের সব্জি। স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত দেশে সব্জির উৎপাদন বেড়েছে পাঁচ গুণ। কৃষি মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, সবজি উৎপাদন বৃদ্ধির হারের দিক থেকে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে। গত এক দশকে এদেশে কৃষিজমির পরিমাণ না বাড়লেও সব্জি আবাদি জমির পরিমাণ বেড়েছে পাঁচ শতাংশ হারে। এ হার বিশ্বে সর্বোচ্চ (FAO)। গত এক যুগে দেশে মাথাপিছু সব্জির - ভোগ বেড়েছে প্রায় ২৫ শতাংশ। বর্তমানে এদেশে ২ কোটি ১০ লাখ কৃষক পরিবার রয়েছে।**

কৃষিখাতে পরিবর্তনের ধারা

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) সারাদেশে ২৪টি দানাশস্য বীজ উৎপাদন খামার, ২টি পাট বীজ উৎপাদন খামার, ২টি আলু বীজ উৎপাদন খামার, ৪টি ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদন খামার, ২টি সবজি বীজ উৎপাদন খামার ও ৯০টি চুক্তিবদ্ধ চাষি জোনের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এ ছাড়া এ সংস্থা ৯টি উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র ও ১৪টি এগ্রো-সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে উৎপাদিত বিভিন্ন ফসলের চারা, কলম, গুটি ইত্যাদি উৎপাদন ও চাষি পর্যায়ে বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সারাদেশে ৯০টি চুক্তিবদ্ধ চাষি জোনের আওতায় চাষি সংখ্যা ১,০০,১০০ জন এবং জমির পরিমাণ ২,৫৯,৫৮০.৩২ একর।

কৃষিখাতে পরিবর্তনের ধারা

২. গবাদিপশু প্রতিপালন: বাংলাদেশে গবাদিপশু হলো গৃহপালিত পশু। যেসব পশুকে অল্প কষ্টে গৃহে পালন করে প্রয়োজনীয় উপকার লাভ করা যায়, সেসব পশুকে গৃহপালিত পশু বলা হয়। সাধারণভাবে গৃহপালিত পশুর মধ্যে গরু, ছাগল, ভেড়া এবং মহিষের নাম গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া রয়েছে উন্নত জাতের কুকুর, বিড়াল, শূকর ইত্যাদি। ধনী দেশে মানুষ গৃহে হরিণ পর্যন্ত পুষে থাকেন। সাধারণভাবে গরু, ছাগল, ভেড়া এবং মহিষ লালন-পালন করে আমাদের বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ অনেক অনেক উপকার পাচ্ছেন। কারণ, সস্তায় এবং সহজে দুধ ও মাংস পাবার অন্যতম উপায় হলো এসব গবাদিপশু লালন-পালন করা। আমাদের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে গবাদিপশুর গুরুত্ব অপরিসীম।

গবাদিপশু/প্রাণীর পরিবর্তনের ধারা

প্রাণী	সংখ্যা (লক্ষ)		
	২০০৬–০৭	২০১৪–১৫	২০২০–২১
গরু	২২৮.৭	২৩৬.৩৬	২৪৫.৫০
মহিষ	১২.১	১৪.৬৪	১৫.০১
ছাগল	২০৭.৫	২৫৭.১১	২৬৬.০০
ভেড়া	২৬.৮	৩৩.১৩	৩৬.৮০
মোট গবাদি প্রাণী	৪৭৫.১	৫৪২.২৭	৫৬৩.৩০

উৎস : প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

কৃষিখাতে পরিবর্তনের ধারা

উপকারিতা

গবাদিপশু প্রতিপালনের উপকারিতা বহুবিধ।

যেমন-

(i) বেকারত্ব দূরীকরণ ও আত্মকর্মসংস্থান: বাংলাদেশ দরিদ্র জনবহুল দেশ। শহরে ও গ্রামে সর্বত্রই বেকারদের সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ বেকারত্ব দূরীকরণ ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গবাদিপশু প্রতিপালন ভূমিকা পালন করে।

(ii) নারীদের কর্মসংস্থান: গ্রামীণ দরিদ্র নারীরা গবাদিপশু লালন-পালন করে অনেকেই স্বাবলম্বী হতে পারে। যেহেতু বাংলাদেশ গ্রামপ্রধান এবং অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী তাই নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির অপার সম্ভাবনা রয়েছে এ খাতে।

(iii) দুধ ও মাংসের যোগান: পৃথিবীতে যত গরু-মহিষ আছে তার শতকরা ১২ ভাগ গরু আছে আমাদের দেশে। তা সত্ত্বেও বিষয়টি বোঝাই যায় না। গরু ও ছাগল উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ।

কৃষিখাতে পরিবর্তনের ধারা

উন্নত দেশের সাথে তুলনা করলে দেখা যায়, মাঝারি সাইজের একটি গাভী বছরে দুধ দেয় যুক্তরাষ্ট্রে গড়পড়তা ৩২৮০ কেজি, ডেনমার্কে ৩৭১০ কেজি, সুইজারল্যান্ডে ৩২৫০ কেজি এবং বাংলাদেশে একই সাইজের গাভী বছরে দুধ দেয় ৪০০ থেকে ৫০০ কেজি।" এর অন্যতম কারণ হলো বাংলাদেশের তৃণ, ঘাস বা খড়ে আমিষ, শর্করা, খনিজ পদার্থ, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন প্রভৃতি কম আছে। দুধের পাশাপাশি জনবহুল এ দেশে খাদ্য তালিকায় প্রয়োজনীয় মাংসের যোগান দেয় গবাদিপশু যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।

দুধ, ডিম ও মাংসের যোগানের পরিবর্তনের ধারা

দ্রব্য	একক	উৎপাদন		
		২০০৬–০৭	২০১৪–১৫	২০২২–২৩
দুধ	লক্ষ মেট্রিক টন	২২.৮	৬৯.৭০	১৪০.৬৮
মাংস	লক্ষ মেট্রিক টন	১০.৪	৫৮.৬০	৮৭.১০
ডিম	লক্ষ টি	৫৩৬৯০	১,০৯,৯৫২	২,৩৩৭.৬৩

উৎস : প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

কৃষিখাতে পরিবর্তনের ধারা

(iv) চাষের কাজে : শক্তিশালী ষাঁড় এবং মহিষকে চাষের কাজে ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশে এখনো সেই প্রাচীন পদ্ধতিতে কৃষকরা চাষের জমিতে গরু, মহিষ ও ষাঁড়ের সাহায্যে চাষের জমিতে লাঙল ব্যবহার করে। (v) যাতায়াত: সাধারণত গ্রামেগঞ্জে যেসব পথে যান্ত্রিক গাড়ি চলে না, সেসব পথে মালপত্র, যাত্রী একস্থান হতে অন্যস্থানে আনা-নেওয়া করতে গরুর গাড়িই একমাত্র ভরসা। এক্ষেত্রে বলদ বা ষাঁড় ব্যবহার করা হয়।

এছাড়া সাবান শিল্প, পশম হতে পোশাক তৈরি, জৈবসার ও বায়োগ্যাস উৎপাদন এবং জাতীয় আয় ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন প্রভৃতি ক্ষেত্রে গবাদি ও গৃহপালিত পশুর গুরুত্ব রয়েছে।

কৃষিখাতে পরিবর্তনের ধারা

৩. হাঁস-মুরগি প্রতিপালন: ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে আমিষজাতীয় খাদ্যের ঘাটতি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে পুষ্টির অভাবে মানসিক বিকাশ বিঘ্নিত হচ্ছে দেশের অগনিত শিশুর। আমিষের এ অভাব মেটাতে হাঁস-মুরগি পালনের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান বিশেষ জরুরি। এছাড়া বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থান, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে গ্রামীণ অর্থনীতিতে এটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। খুব অল্প সময়ে অল্প পুঁজি বিনিয়োগ করে সাম্প্রতিক সময়ে হাঁস-মুরগি পালন একটি লাভজনক ও সম্ভাবনাময় কৃষি শিল্প হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে সঠিক পরিকল্পনায় হাঁস-মুরগি খামার স্থাপনের মাধ্যমে হাঁস-মুরগি পালনকে লাভজনক করে তোলা যায়। তাই বাংলাদেশে উন্নত জাতের হাঁস-মুরগি পালনে জনগণের উৎসাহ দিন দিন বেড়ে চলেছে। হাঁস-মুরগি পালনের জন্য বাংলাদেশের আবহাওয়াও বেশ উপযোগী। সরকারও জনগণকে উন্নত জাতের হাঁস-মুরগি পালনে সার্বিক সহযোগিতা ও উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছে।

সাধারণ মানের বসতবাড়িতে অল্প শ্রম ও কম খরচে হাঁস-মুরগি পুষে পরিবারের প্রোটিনজাতীয় খাদ্যের ঘাটতি সহজেই মেটানো যায়।

পারিবারিকভাবে হাঁস-মুরগি পালনের ফলে পরিবারের অল্প বয়স্ক ছেলে-মেয়ে, যুবক-যুবতী এমনকি বুড়ো-বুড়িরাও তাদের অবসর সময়ে কিছু না কিছু কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারে। এছাড়া, হাঁস-মুরগির সাথে কবুতর, কোয়েল, ময়ূর ও উটপাখি পালনও বেশ লাভজনক।

কৃষিখাতে পরিবর্তনের ধারা

৪. মৎস্য চাষ: নদীমাতৃক বাংলাদেশ। ধান ও মাছের প্রাচুর্য্য ছিল বলেই এক সময়ে আমাদেরকে বলা হতো মাছে ভাতে বাঙালি। বিভিন্ন সময়ে ধানের উচ্চফলনশীল বীজ আবিষ্কার এর পাশাপাশি মৎস্য চাষ, আহরণ বা উৎপাদনেও অনেক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। দেশে বর্ধিত জনসংখ্যার খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা মেটাতে মাছ বহুলাংশে সক্ষম। মাছ অত্যন্ত পুষ্টিকর আমিষজাতীয় খাদ্য। বাংলাদেশে আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে প্রাণিজ আমিষের প্রায় ৬২.৫৮% আসে মৎস্য হতে।* মাছের এ বিপুল চাহিদা পূরণ করতে হলে প্রয়োজন সঠিক পদ্ধতিতে মাছের চাষ। পারিবারিক এবং বাইরের চাহিদা মেটানোর জন্য ঘরের কাছের খালি জায়গাটুকুতেই অনায়াসে মৎস্য খামার গড়ে তোলা যায়। এর ফলে একদিকে যেমন বেকারত্ব দূর করা সম্ভব হবে অন্যদিকে নিজের সহ পারিবারিক অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জনেও সহায়ক হবে। প্রত্যেকের বাড়ির আশেপাশের ডোবা, পুকুর এবং গ্রাম পর্যায়ের জলাশয়গুলো মাছ চাষের আওতায় আনা সম্ভব হলে দেশ হবে উপকৃত এবং দূর হবে বেকারত্ব।

কৃষিখাতে পরিবর্তনের ধারা

মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষের সরবরাহ বৃদ্ধির পরিবর্তনের ধারা

(লক্ষ মেট্রিক টন)

উৎস	২০০৬–০৭	২০১৩–১৪	২০২১–২২	২০২৩–২৪*
অভ্যন্তরীণ জলাশয়	১৯.৫২	২৯.৫১	৪০.৫৩	৪৩.৯৮
সামুদ্রিক	৪.৮৭	৫.৯৬	৭.০৬	৬.৮২
সর্বমোট	২৪.৩৯	৩৫.৪৭	৪৭.৫৯	৫০.৮০

* প্রক্ষেপিত

কৃষিখাতে পরিবর্তনের ধারা

৫. চিংড়ি চাষ: চিংড়ি বাংলাদেশের একটি অর্থকরী সম্পদ। প্রতি বছর বিদেশে চিংড়ি রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ করা হয়। চিংড়ির বাজার বললে আন্তর্জাতিক বাজার" বোঝায়। পৃথিবীর প্রায় ৬০টি দেশে বাংলাদেশের চিংড়ি রপ্তানি হয়ে থাকে। আমাদের দেশে সাধারণ মাছের তুলনায় রপ্তানিযোগ্য চিংড়ি মাছের দাম সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। বিভিন্ন পদ্ধতিতে চিংড়ি মাছকে বিশ্ববাজারে পাঠানো হয়ে থাকে। যেমন: (i) ঠাণ্ডায় জমানো চিংড়ি, (ii) শুকনো চিংড়ি, (iii) টিনের প্যাকিং করা চিংড়ি এবং (iv) গুড়ো করা চিংড়ি। বাংলাদেশে প্রচলিত চিংড়ি চাষ পদ্ধতি চার প্রকার। যেমন: সনাতন পদ্ধতি, উন্নত হালকা পদ্ধতি, আধা নিবিড় এবং নিবিড় পদ্ধতি। সনাতন পদ্ধতিতে পুঁজি বিনিয়োগ কম, প্রতি হেক্টরে উৎপাদন ১২০-১৫০ কেজি। নিবিড় পদ্ধতিতে পুঁজি ও ঝুঁকি অধিক উৎপাদনও প্রতি হেক্টরে ৫-১০ টন।

কৃষিখাতে পরিবর্তনের ধারা

চিংড়ির শ্রেণিবিভাগ

সাধারণত আমাদের দেশের খালে-বিলে, পুকুরে, ঝিলে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে লালন-পালন করা চিংড়ি মাছ পাওয়া যায়। এগুলো চাষ করতে হয় না, প্রাকৃতিকভাবে নিজেরাই ডিম পাড়ে, বাচ্চা ফুটিয়ে বিনা খরচে বংশবিস্তার করে। দুটো প্রজাতির চিংড়ি বিদেশে রপ্তানির জন্য চাষ করা হয়। এগুলো হলো: (ক) বাগদা চিংড়ি ও (খ) গলদা চিংড়ি।

বাগদা চিংড়ি: চিংড়ি মাছের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হলো বাগদা চিংড়ি। লোনা পানিতে চাষ করার পক্ষে এ জাতটি খুবই উপযোগী এবং এরা খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠতে পারে। আবহাওয়ার তারতম্য এবং পানির লবণাক্ততার হ্রাস-বৃদ্ধিতে এদের কোনো ক্ষতি হয় না। এরা ডিম পাড়ে প্রচুর, দ্রুত বংশ বৃদ্ধি করতে পারে। বাচ্চা অবস্থায় ৪০-৫০ মি.মি. সাইজের বাগদা মাত্র তিন মাসের মধ্যে ২৮ থেকে ৩০ গ্রাম পর্যন্ত ওজনের হয়ে থাকে। আরও একটু বড় হলে এগুলোকে বিদেশে রপ্তানির জন্য প্রস্তুত করা হয়। এ মাছ শুধু লোনা পানিতেই চাষ করা হয়।

কৃষিখাতে পরিবর্তনের ধারা

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের নদীর মোহনায় ভেরী বা নোনাঘেরি বা স্থানীয় ভাষায় পাক্কালি ব্যবহার করে চিংড়ি মাছের রেণু পোনা সংগ্রহ করা হয়, তবে এটি অবৈজ্ঞানিক পন্থা। ইদানিং অনেক খামারি মিঠাপানির এলাকায় লোনা পানির পরিবেশ তৈরি করে এরূপ চিংড়ির চাষ করছেন।

কোনো নির্দিষ্ট নিম্ন এলাকায় পরিধি বরাবর মাটির বাঁধ বেঁধে একদিকে একটা গেট তৈরি করে ভেতরে জোয়ারের পানি ঢুকিয়ে ঐ এলাকা ডুবিয়ে দেয়া হয়। এতে পানির সঙ্গে নানা জাতের মাছ ও চিংড়ির বীজ আটকা পড়ে। কয়েক মাস পরে এগুলো তুলে বিক্রয় করা হয়।

চাষযোগ্য চিংড়ি মাছের নিম্নলিখিত গুণ থাকা দরকার-

(i) দ্রুত বৃদ্ধির হার।

(ii) চাষযোগ্য এলাকায় বীজের প্রাচুর্যতা।

(iii) পরিপূরক খাদ্য গ্রহণ ক্ষমতা।

(iv) বদ্ধ জলাশয়ে প্রাকৃতিক খাদ্যগ্রহণ ক্ষমতা।

(v) পানির লবণাক্ততা ও তাপমাত্রা হ্রাস-বৃদ্ধি সহ্য করার ক্ষমতা।

কৃষিখাতে পরিবর্তনের ধারা

৬. মাশরুম (Mushroom) চাষ: মাশরুম হলো এক প্রকার ভক্ষণযোগ্য মৃতজীবী ছত্রাকের ফলন্ত অঙ্গ 'প্রোটিন ও আমিষ সমৃদ্ধ সবজি, যা সবজি মাংস (Vegetable meat) হিসেবে পরিচিত। বিশ্বে প্রায় তিন লক্ষ প্রজাতির ছত্রাক চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু যেসব ছত্রাক সম্পূর্ণ খাওয়ার উপযোগী, পুষ্টিকর ও সুস্বাদু, শুধুমাত্র সেগুলোকে মাশরুম হিসেবে ছত্রাকবিদরা শনাক্ত করেছেন। তবে বনে জঙ্গলে অনেক ধরনের ছাতা আকৃতির ছত্রাক জন্ম নেয়, যা খাওয়ার অনুপযোগী এবং বিষাক্ত। চাষ করা মাশরুম কখনোই বিষাক্ত হয় না। এটি সম্পূর্ণ হালাল সবজি। মাশরুম অত্যন্ত পুষ্টিকর, সুস্বাদু ঔষধি গুণসম্পন্ন সবজি। মাশরুমে আছে (শুকনা ওজনে): (i) আমিষ ২৫-৩০%; (ii) ভিটামিন, মিনারেল ও আঁশ ৫৭-৬০%; (iii) চর্বি ৫-৬%; (iv) শর্করা ৪-৬%।

কৃষিখাতে পরিবর্তনের ধারা

মাশরুমের ঔষধি গুণাগুণ"

মাশরুম উৎপাদন শুধু বাণিজ্যিক সাফল্যের কারণে নয়, এটি অত্যন্ত ওষুধি গুণসমৃদ্ধ খাবার। যেমন:

(i) এটি প্রচুর ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ। তাই শিশুদের হাড় ও দাঁত গঠনে বিশেষ কার্যকর।

(ii) উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস রোগে যারা আক্রান্ত তাদের জন্য মাশরুম অত্যাবশ্যক।

(iii) মাশরুমে ইরিটাডেনিন নামক এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ আছে, যা রক্তের চর্বি কমাতে সাহায্য করে। তাই এটি হৃদরোগীদের জন্য আদর্শ খাবার।

(iv) এটি টিউমারের বৃদ্ধি কমিয়ে দেয়, এনিমিয়া বা রক্তস্বল্পতা দূর করে এবং ক্যান্সার কোষের বৃদ্ধি ও শ্বসন প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেয়। মাশরুমে ট্রাইটারপিন থাকায় এটি বিশ্বে এইডস প্রতিরোধক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

(v) মাশরুম শক্তি বৃদ্ধিকারক, ডেঙ্গু জ্বর প্রতিরোধী, অর্শরোগ প্রতিরোধক, মেদ ভুঁড়ি কমাতে সহায়ক।

(vi) এটি বয়স্কদের আদর্শ আমিষ, অ্যাজমারোগ নিরাময়ক, রূপচর্চায় অতুলনীয়।

(vii) বাচ্চা ও গর্ভবতী মায়েদের আদর্শ খাবার, কোষ্ঠকাঠিন্য ও বদহজম দূর করে, এলার্জি রোগের মহৌষধ, চর্ম রোগে উপকারী, জন্ডিস রোগের প্রতিষেধক এবং চুল পড়া ও পাকা রোধ করে।

কৃষিখাতে পরিবর্তনের ধারা

৭. বনায়ন: সাধারণত যে এলাকা ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ বৃক্ষ; নানা প্রজাতির লতাপাতা দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে এবং যেখানে বন্য পশু-পাখি, কীটপতঙ্গ ও অন্যান্য জীব প্রাকৃতিক পরিবেশে বসবাস করে, তাকে বন (Forest) বলা হয়। যেকোনো দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্যের জন্য দেশের মোট আয়তনের ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে ২০২৩-২৪ এর তথ্যানুসারে, বাংলাদেশে বনসহ বৃক্ষাচ্ছাদিত এলাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে এখন দেশের মোট আয়তনের প্রায় ২২.৩৭ শতাংশ (সরকার নিয়ন্ত্রিত বনভূমি দেশের মোট আয়তনের ১৫.৫৮ শতাংশ, বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত বন দেশের মোট আয়তনের প্রায় ১০.৭৪ শতাংশ।)। উৎপত্তির উৎস অনুসারে বাংলাদেশের বিদ্যমান বনকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা- (ক) প্রাকৃতিক বন (Natural forest) এবং (খ) কৃত্রিম বন (Artificial forest) যা মানুষ কর্তৃক নির্মিত।

কৃষিখাতে পরিবর্তনের ধারা

আবার অবস্থান, মৃত্তিকার প্রকৃতি ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে বনভূমিকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

(i) ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বনভূমি: মোট আয়তন ১৫ হাজার ৩২৬ বর্গকিলোমিটার। রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবানে ১২ হাজার ১৩০ বর্গকিলোমিটার এবং সিলেট, সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জে ৭৯৬ বর্গকিলোমিটার। বাংলাদেশের মোট বনভূমির ১২ ভাগ জায়গা জুড়ে এটি অবস্থিত। চাপালিশ, তেলসুর, মেহগনি, ময়না, চম্পা, জলপাই, কদম, গর্জন, অর্জুন ইত্যাদি উদ্ভিদ এখানে ভালো জন্মে। এ বনভূমির মধ্যে নিয়ন্ত্রিত বন ২৪ ভাগ, অশ্রেণিকৃত ৭৫ ভাগ এবং সংরক্ষিত বন ১ ভাগ।

(ii) পাতাঝরা গাছের বনভূমি: এ বনভূমির মোট আয়তন ৮৭৫ বর্গকিলোমিটার। বাংলাদেশের ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, গাজীপুর, রংপুর ও দিনাজপুরে এটি অবস্থিত যা মোট বনভূমির ৮ ভাগ। এখানে শাল ও গজারি ভালো জন্মে।

কৃষিখাতে পরিবর্তনের ধারা

(iii) সুন্দরবন যা Tidal বা Mangrove বনাঞ্চল নামে পরিচিত। এর মোট আয়তন ১০,০০০ বর্গকিলোমিটারের বাংলাদেশ অংশে ৬০১৭ বর্গকিলোমিটার (৬০.১৭%)। যা বাংলাদেশের আয়তনের ৪.২% এবং সমগ্র বনভূমির প্রায় ৪৪%।* সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট জেলার দক্ষিণাংশ নিয়ে এ বনভূমি অবস্থিত। এখানে সুন্দরি, গেওয়া ও গরান ভালো জন্মে। এখানে মোট ভূমির ২৮ ভাগ মৃদু লবণাক্ত, ৪৬ ভাগ পরিমিত লবণাক্ত এবং ২৬ ভাগ চরম লবণাক্ত। বাংলাদেশের একমাত্র কৃত্রিম ম্যানগ্রোভ বন-চকোরিয়া, কক্সবাজার। বাংলাদেশে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের মোট আয়তন ৭,৪১২ বর্গ কিলোমিটার। বাংলাদেশের মোট ভূমির ০.৮৩ ভাগ সমতল বনভূমি, উপকূলীয় বনায়ন ০.৭৬ ভাগ এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন বন ১.৮৭ভাগ। সর্বাধিক হলো পাহাড়ি বনভূমি ৪.৬৫ ভাগ এবং ম্যানগ্রোভ বনভূমি ৪ ভাগ। কিন্তু এ হারও ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে।

কৃষিখাতে পরিবর্তনের ধারা

বন ও নার্সারি স্থাপন পরিবেশগত ও অর্থনৈতিকভাবে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর বাসস্থান, খাদ্যের যোগান, যাতায়াত, জ্বালানি চাহিদা পূরণে বনজসম্পদ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বৃক্ষ ও বনজসম্পদ সামগ্রী সরবরাহকারীদের প্রায় ৬৫ শতাংশ মহিলা। ৫৪% পরিবার বৃক্ষ ও বন থেকে ঔষধি উপকার পেয়েছে। কিন্তু এদেশের মাথাপিছু বনভূমির পরিমাণ মাত্র ০.০১৮ হেক্টর। বাংলাদেশে মোট বনভূমির আয়তন ২.৩২ মিলিয়ন হেক্টর। এর মধ্যে ১.৬০ মিলিয়ন হেক্টর বন অধিদপ্তরের আওতাধীন। অবশিষ্ট ০.৭২ হেক্টর জেলা প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণাধীন। অধিদপ্তরের আওতাভুক্ত বনভূমির মধ্যে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট ১.৪০ মিলিয়ন হেক্টর এবং অবশিষ্ট প্রায় ০.২০ মিলিয়ন হেক্টর উপকূলীয় অঞ্চলে কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট।

এছাড়াও দেশের সর্বত্র প্রায় ০.৭৭ মিলিয়ন হেক্টর বসতবাড়ি এবং প্রান্তিক পতিত ভূমি বৃক্ষাচ্ছাদনে আবৃত। বনজ সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৬৭ সাল হতে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমের সূচনা হয় ঢাকা ও রাজশাহীতে। ১৯৮০ সালের পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠীর সহায়তায় সমগ্র দেশে এ প্রকল্পের বিস্তৃতি ঘটে। জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষির একটি উপ-খাত (Sub-Sector) হলো বনজ সম্পদ। মোট দেশজ উৎপাদনে (GDP) বনজ সম্পদের অবদানও কম নয়। নিম্নের সারণিতে বনজ সম্পদের প্রবৃদ্ধির হার দেখানো হলো :

কৃষিখাতে পরিবর্তনের ধারা

সন	১৯৯০–৯১	১৯৯১–৯২	২০০৬–০৭	২০১৯–২০	২০২১–২২	২০২৩–২৪*
বনজ সম্পদ	২.৫	২.৫	৫.৫০	৫.৩৪	৫.০৮	৫.০৮

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো; * সাময়িক

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলা (বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি), গ্রিন হাউস গ্যাস, কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস নির্গমন প্রতিক্রিয়া হ্রাস করার জন্য সবুজ বনায়ন করা জরুরি।

কৃষিখাতে পরিবর্তনের ধারা

৮. নার্সারি স্থাপন: ফুল, ফল, বৃক্ষ ও নানান প্রকারের সৌন্দর্যবর্ধক গাছের চারার খামারভিত্তিক বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে চাষাবাদ বা উৎপাদন করাই হলো নার্সারি।

সাধারণত বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে নার্সারি স্থাপনের উদ্যোগ বেশি। ইদানিং গ্রামে-গঞ্জেও নার্সারি স্থাপনের উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়। নিজেদের বসতবাড়িতে অব্যবহৃত জায়গায়, শহরে বাসা-বাড়ির ছাদে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ জাতীয় লাভজনক খামার বা নার্সারি স্থাপন করা যায়। এর ফলে বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি পরিবারের আয়ও বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে বাড়ির মহিলা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সবাই অবসর সময় কাটাতে পারে। বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে এ খাতের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে বলা যায়। সরকারিভাবে, বিএডিসি ৯টি উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র ও ১৪টি এগ্রো-সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে উৎপাদিত বিভিন্ন ফসলের চারা, কলম ও গুটি উৎপাদন এবং চাষি পর্যায়ে বিতরণ করছে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ২য় পত্র

অধ্যায় ০২ : বাংলাদেশের কৃষি

টপিক – ০৬ কৃষিঋণ

কৃষিঋণ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

কৃষিঋণ

কৃষকরা কেন ঋণ গ্রহণ করে?

বাংলাদেশ একটি কৃষিনির্ভর দরিদ্র দেশ। এদেশের কৃষকগণ উপকরণ ক্রয়, কৃষিজমির রক্ষণাবেক্ষণ, উৎপাদিত ফসলের বাজারজাতকরণ ইত্যাদি কারণে ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। সেজন্য কৃষিঋণকে কৃষকের প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

১. উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে কৃষিঋণ: উদ্দেশ্যের দিক থেকে কৃষিঋণকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

(i) উৎপাদনশীল ঋণ: যে ঋণ প্রত্যক্ষভাবে কৃষি উৎপাদনশীলতাকে প্রভাবিত করে, তাকেই উৎপাদনশীল ঋণ বলে। যেমন-বীজ, সার, ওষুধ, গরু, সেচব্যবস্থা, মজুরি দেয়া, জমির স্থায়ী উন্নয়ন ইত্যাদি সবই উৎপাদনশীল ঋণ। কৃষি উৎপাদনের স্বাভাবিক কার্যক্রম বজায় রাখার জন্য এ ধরনের ঋণের প্রয়োজন। প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে এ ধরনের ঋণ পাওয়া যায়।

কৃষিঋণ

কৃষকরা কেন ঋণ গ্রহণ করে?

(ii) ভোগ্য ঋণ: প্রান্তিক কৃষক ও ভূমিহীন কৃষকদের এক ঋতুর ফসলে বছরের ভরণপোষণ সংগ্রহ সম্ভব হয় না। এছাড়া বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি কারণে ফসলহানি ঘটে। এ সময় কৃষকদের দৈনন্দিন প্রয়োজন তথা বেঁচে থাকার জন্য ভোগ্যঋণ গ্রহণের প্রয়োজন হয়। এ ধরনের অনুৎপাদনশীল ঋণ গ্রাম্য মহাজন, সাহুকার, ভূ-স্বামীর নিকট থেকে উচ্চ সুদের হারে সংগ্রহ করতে হয়।

(iii) অনুৎপাদনশীল ঋণ: ভোগ ছাড়াও কৃষককে নানা ধরনের অনুৎপাদনশীল কর্ম যেমন-মামলা মোকদ্দমা, সন্তানদের বিয়েশাদী, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতি কাজে ঋণ গ্রহণ করতে হয়। যেহেতু এসব খাত অনুৎপাদনশীল তাই এ ঋণও মহাজন ও ভূস্বামীর নিকট থেকে গ্রহণ করতে হয়।

কৃষিঋণ

কৃষকরা কেন ঋণ গ্রহণ করে?

২. সময়ের ভিত্তিতে কৃষিঋণ: এক্ষেত্রে কৃষিঋণ তিন ধরনের হতে পারে। যথা:

(i) স্বল্পকালীন ঋণ : স্বল্প সময়ের জন্য সাধারণত ১৫ মাস বা তার কম সময়ের জন্য এ ধরনের ঋণ নেয়া হয়। বীজ, সার, কীটনাশক ওষুধ, গরু-মহিষের জন্য খামার ইত্যাদি ক্রয় করার জন্য কৃষকেরা এ ধরনের ঋণ প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে সংগ্রহ করে।

(ii) মধ্যকালীন ঋণ : এ ধরনের ঋণ গরু-মহিষ কেনা, ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি ক্রয়, যন্ত্রপাতি নষ্ট হলে মেরামত ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়। এ ধরনের ঋণের মেয়াদ ১৫ মাস থেকে ৫ বছর পর্যন্ত হতে পারে। এ ঋণের উৎস হলো মহাজন, আত্মীয়-স্বজন, সমবায় সমিতি এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাংকব্যবস্থা।

(iii) দীর্ঘকালীন ঋণ : কৃষিব্যবস্থায় দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের জন্য এ ঋণের প্রয়োজন হয়। যেমন- জমির স্থায়ী উন্নয়ন, নলকূপ বসানো, ট্রাক্টর ক্রয়, ভারী যন্ত্রপাতি ক্রয়, পুরানো ঋণ পরিশোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে এ ঋণের প্রয়োজন। এর মেয়াদকাল ৫ বছরের বেশি হয়ে থাকে। প্রয়োজন অনুসারে বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংক থেকে কৃষকেরা এ ঋণ গ্রহণ করে থাকে।

কৃষিঋণ

কৃষকরা কেন ঋণ গ্রহণ করে?

৩. জামিনের ভিত্তিতে কৃষিঋণ: এ দিক থেকেও কৃষিঋণকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

(i) জমি বন্ধকি ঋণ। অনেক সময় কৃষকেরা নিজেদের ক্ষুদ্র জমি বন্ধক রেখে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করে।

(ii) ঋণ পরিশোধ নিশ্চিত করার জন্য অস্থাবর সম্পত্তির অতিরিক্ত ঋণ। পূর্বের ঋণ পরিশোধ করার জন্য অনেক সময় কৃষক অস্থাবর সম্পত্তির অতিরিক্ত ঋণ গ্রহণ করে। এ ধরনের ঋণ পরিশোধে কৃষকদের শ্রমের গুরুত্বই অধিক।

(iii) ব্যক্তিগত ঋণ। কৃষক ব্যক্তিগত ও পারিবারিক প্রয়োজনেও সম্পদ বন্ধক রেখে ঋণ গ্রহণ করে।

কৃষিঋণ

কৃষকরা কেন ঋণ গ্রহণ করে?

৪. ব্যক্তিগত এজেন্সির ঋণ : কৃষিঋণের এ ধরনের ঋণ ব্যক্তিগত এজেন্সি প্রদান করে থাকে। সাধারণত ঋণ ব্যবসায়ী, ভূস্বামী, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতির কাছ থেকে কৃষকেরা এ ঋণ সংগ্রহ করে। এসব ঋণ বেশির ভাগই শোষণমূলক।

৫. প্রাকৃতিক দুর্যোগ: প্রাকৃতিক দুর্যোগ এর ফলে প্রায় কৃষক পরিবারের জান-মালের প্রচুর ক্ষতিসাধন হয়ে থাকে। তখন অভাবের সম্মুখীন হয়ে তারা ঋণ গ্রহণ করে।

৬. দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি: কৃষকদের আয়ের তুলনায় যদি বাজারে দ্রব্যমূল্য কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায়, তখন সংসার চালানোর জন্য বাধ্য হয়ে ঋণ গ্রহণ করতে হয়।

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, দরিদ্র কৃষক কৃষির উন্নয়ন, পারিবারিক ও সামাজিক প্রয়োজনে কৃষিঋণ গ্রহণ করে। অর্থনীতিবিদ স্যার ফ্রেডারিক নিকলসন-এর মতে, 'পৃথিবীর ইতিহাসের এই সাক্ষ্য যে, কৃষির জন্য ঋণ অত্যাবশ্যক।'

কৃষিঋণ

ঋণের মাধ্যমে অর্থায়ন

বাংলাদেশে ঋণের উৎসসমূহকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা:

(ক) অনানুষ্ঠানিক উৎস (Informal sources)

(খ) উপানুষ্ঠানিক উৎস (Semi-formal sources)

(গ) আনুষ্ঠানিক উৎস (Formal sources)

সাধারণত ঋণের উৎস দু ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

১. প্রাতিষ্ঠানিক উৎস ও ২. অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস।

ওপরের উপানুষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিক উৎসই মূলত প্রাতিষ্ঠানিক উৎস এবং অনানুষ্ঠানিক উৎস বলতে অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসকে নির্দেশ করে।

কৃষিঋণ

ঋণের মাধ্যমে অর্থায়ন

১. প্রাতিষ্ঠানিক উৎস: এটি দু প্রকার। যথা-
(i) উপানুষ্ঠানিক উৎস ও
(ii) আনুষ্ঠানিক উৎস।

উপানুষ্ঠানিক ঋণের উৎস: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অধীনে সাধারণ আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নয় এমন কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নিজস্ব নিয়ম অনুসরণ করে ঋণ দিচ্ছে। ঋণের এ উৎসগুলোকে উপানুষ্ঠানিক ঋণের উৎস বলা হয়। যেমন-এন. জি.ও সমূহ (N.G.O'S) ও গ্রামীণ ব্যাংক।

আনুষ্ঠানিক ঋণের উৎস: বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আইন-কানুন ও শর্তাবলির অধীনে কর্মরত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঋণের আনুষ্ঠানিক উৎস বলা হয়। যেমন-

১. বাংলাদেশ ব্যাংক, ২. বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, ৩. বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ, ৪. ভূমিবন্ধকি ব্যাংক, ৫. রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ১৯৮৭ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়, ৬. সমবায় ঋণদান সমিতি, ৭. বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন বোর্ড, ৮. সমবায় ব্যাংক লিমিটেড ও ৯. সরকার প্রভৃতি।

কৃষিঋণ

ঋণের মাধ্যমে অর্থায়ন

২. অনানুষ্ঠানিক উৎস বা অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস: বাংলাদেশের ঋণের বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করে বাংলাদেশ ব্যাংক। কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকের আইন-কানুন ও শর্তের বাইরে ব্যক্তিগত পর্যায়ে নিজস্ব নিয়মানুযায়ী যে ঋণের আদান-প্রদান হয় তাকে ঋণের অনানুষ্ঠানিক উৎস বা অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস বলে।

এ অনানুষ্ঠানিক ঋণের প্রধান উৎসগুলো নিম্নরূপ:

(i) আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব,

(ii) গ্রাম্য মহাজন,

(iii) গ্রাম্য ব্যবসায়ী ও দোকানদার,

(iv)ধনী কৃষক,

(v) দালাল ও ব্যাপারি এবং

(vi) প্রতিবেশী প্রভৃতি।

কৃষিঋণ

ঋণের মাধ্যমে অর্থায়ন

বাংলাদেশের ঋণের উৎসগুলোকে নিম্নে ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো :

ঋণের উৎস

প্রাতিষ্ঠানিক উৎস		অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস বা
উপানুষ্ঠানিক উৎস	আনুষ্ঠানিক উৎস	অনানুষ্ঠানিক উৎস
এন. জি. ও সমূহ ও গ্রামীণ ব্যাংক	কেন্দ্রীয় ব্যাংক, বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, ভূমিবন্ধকি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, সমবায় ঋণদান সমিতি, বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন বোর্ড, সমবায় ব্যাংক লিমিটেড ও সরকার প্রভৃতি।	আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, গ্রাম্য মহাজন, গ্রাম্য ব্যবসায়ী ও দোকানদার, ধনী কৃষক, দালাল ও ব্যাপারি, প্রতিবেশী প্রভৃতি।

কৃষিঋণ

ঋণের মাধ্যমে অর্থায়ন

বাংলাদেশের কৃষি ঋণ পরিস্থিতি: ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট (ইফপ্রি) সমীক্ষা- বাংলাদেশের কৃষকরা-বেসরকারি সংস্থা (এনজিও), আত্মীয়-স্বজন, বেসরকারি ব্যাংক, দাদন ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন বেসরকারি উৎস থেকে প্রায় ৮১ শতাংশের অধিক ঋণ গ্রহণ করে যেখানে সুদের হার ১৯ শতাংশ হতে ৬৩ শতাংশ। মোট ঋণের মাত্র ৬ শতাংশ ঋণ কৃষি ব্যাংক থেকে নেয় যেখানে সুদের হার ৯ শতাংশ। ২০ মে, ২০১৯ কৃষি মন্ত্রণালয়ে এ সমীক্ষা জমা দিয়েছে 'ইফপ্রি'। সেখানে কৃষিঋণের উৎস দেখানো হয়েছে- (i) আত্মীয়/বন্ধু হতে ১৮.৮%, (ii) এনজিও হতে ৩৬.৪%, (iii) দাদন হতে ১১.৪%, (iv) জমি বন্ধক রেখে ১৪.৮% এবং (v) কৃষি ব্যাংক হতে ৬.১%। সবচেয়ে বেশি সুদ নেন দাদন বা সুদের কারবারিরা। তাঁরা ৬৩ শতাংশ হারে সুদ নেন। মূলত জরুরি কৃষি উপকরণ যেমন সার, কীটনাশক ও সেচের খরচ জোগাতে কৃষক এদের নিকট হতে ঋণ গ্রহণ করে। কোনো জামানত ছাড়া শুধু ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা পরিচয়ের ভিত্তিতে এসব ঋণ দেয়া হয় বলে কৃষক এ ঋণ নেয়। ঋণের সুদের হারের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে-'এনজিও'। এখাত থেকে বছরে সোয়া লাখ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হয় বিভিন্ন ফসলের মৌসুমে, তিন থেকে পাঁচ মাস সময়ের জন্য প্রদেয় এ ঋণের সুদের হার ২৪ শতাংশ। দেশের বিভিন্ন বেসরকারি ব্যাংকের গ্রামীণ ঋণের একটি বড় অংশ কৃষিঋণ তাদের গড় সুদের হার ১৩ শতাংশের বেশি; বিভিন্ন সমবায় সমিতি হতে গৃহীত ঋণের সুদের হার গড়ে ১৯ শতাংশ এবং আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে নেওয়া ঋণের সুদের হার ৮ শতাংশ।

কৃষিঋণ

ঋণের মাধ্যমে অর্থায়ন

সরকারের কৃষি ব্যাংক থেকে আসা ঋণের (প্রায় ৬%) সবচেয়ে বেশি অংশ পান বড় চাষিরা (প্রায় ১৫%)। বড়, মাঝারি ও ছোট চাষি মিলে মোট ঋণের ৩৬ শতাংশ পান। প্রান্তিক চাষি পান ৫%। বর্গা চাষিরা এ ঋণ পান না।

উচ্চ সুদে ঋণের ফলে বাংলাদেশে ধানের উৎপাদন খরচও প্রতিবেশী দেশ ও প্রধান ধান উৎপাদনকারী দেশের তুলনায় বেশি। ভারতের কৃষি মন্ত্রণালয়ের হিসেবে ২০১৮-১৯ বর্ষে এক কেজি ধানের উৎপাদন খরচ বাংলাদেশি টাকায় ১৮.৭৫ টাকা, সরকার ক্রয় করছে সেখানে ২০.৮০ টাকায়। প্রধান ধান উৎপাদনকারী দেশ থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া ও ভিয়েতনামেও প্রতি কেজি ধান উৎপাদনে খরচ ২০ টাকার কম। আর বাংলাদেশে প্রতি কেজি ধানের উৎপাদন খরচ ২৫ টাকা।

বাংলাদেশের কৃষককে লোকসান থেকে বাঁচাতে হলে কম সুদে কৃষকের জন্য ঋণ সহজলভ্য করা প্রয়োজন।

-ইফপ্রি কান্ট্রি ডিরেক্টর 'আখতার আহমেদ' ৯ জুন, ২০১৯, প্রথম আলো

কৃষিঋণ

ঋণের মাধ্যমে অর্থায়ন

প্রাতিষ্ঠানিক উৎস

(ক) উপানুষ্ঠানিক উৎস: উপানুষ্ঠানিক উৎসের মধ্যে বিভিন্ন NGO ও গ্রামীণ ব্যাংক উল্লেখযোগ্য। NGO আবার দু প্রকার। যথা- (i) বিদেশি ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট বাংলাদেশি NGO এবং (ii) স্থানীয় NGO।

বাংলাদেশে কার্যরত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে ২০০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (MRA) কর্তৃক ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত মোট ৮৯২টি প্রতিষ্ঠানকে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার সনদ প্রদান করা হয়েছে এবং নানা অনিয়মের অভিযোগে ১৫৫টি প্রতিষ্ঠানের সনদ বাতিল করা হয়েছে। ১০০ কোটি টাকার ঊর্ধ্বে কৃষিঋণ বাস্তবায়নরত NGO সমূহ হলো-BRAC, CARE, CARITAS, Gono Shasthya Kendra, Proshika, RDRS ও World Vision. ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত সনদপ্রাপ্ত ৭৩৭টি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান দেশের ৪ কোটির অধিক গ্রাহকের জীবনমান উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

কৃষিঋণ

ঋণের মাধ্যমে অর্থায়ন

এছাড়া গ্রামীণ ব্যাংক' একাই প্রায় ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত ২,৫৬৮টি শাখার মাধ্যমে সারাদেশে ৬৪ জেলার ৪৭৯ উপজেলার ৮১,৬৭৮টি গ্রামে ১০৫.২১ লক্ষ সদস্যকে ঋণের আওতায় এনে তাদের আর্থিক ও সামাজিক জীবনমান উন্নয়নের উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে। সদস্যদের প্রায় ৯৭ শতাংশই মহিলা। অর্থাৎ বিভিন্ন এন.জি.ও-সমূহ ও গ্রামীণ ব্যাংক বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে সর্বমোট প্রায় ৭ কোটি দরিদ্র কৃষক, ভূমিহীন, বর্গাচাষি সদস্যের সাথে ঋণ কার্যক্রমে জড়িত। এ সকল সংস্থার কর্মক্ষেত্র কৃষি, মৎস্য, বন ও পরিবেশ, যুব উন্নয়ন, স্বকর্মসংস্থান, পানীয় জল ও পয়ঃব্যবস্থা, পল্লি উন্নয়ন, মহিলা ক্ষমতায়ন, স্বাস্থ্য, বনায়ন, পশুপালন ইত্যাদি।

কৃষিঋণ

ঋণের মাধ্যমে অর্থায়ন

(খ) আনুষ্ঠানিক উৎস-ব্যাংক ঋণ: আনুষ্ঠানিক উৎসের মধ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক, বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিশেষায়িত ব্যাংকই প্রধান।

(১) বাংলাদেশ ব্যাংক বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক: যেসব ব্যাংক ও সংস্থা বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সরাসরি ঋণ প্রদান করে,

বাংলাদেশ ব্যাংক সেসব সংস্থাকে কম সুদে ঋণ প্রদান করে। যেমন: বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও সমবায় ব্যাংককে প্রচলিত ব্যাংক হার অপেক্ষা ২% কম সুদে ঋণ দিয়ে থাকে। কৃষকদেরকে ঋণ প্রদানে সাহায্য করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক 'কৃষি বিভাগ' চালু করেছে।

(২) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক: কৃষকদেরকে ঋণ দেওয়ার জন্যই কৃষি ব্যাংক স্থাপিত হয়েছে। সাধারণত কৃষককে কৃষি যন্ত্রপাতি, সেচের জন্য গভীর-অগভীর নলকূপ, পাম্পিং মেশিন, হালের গরু ক্রয়, বীজ, সার, কীটনাশক, মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগি ও পশুপালন, বিপণন প্রভৃতি উদ্দেশ্যে ঋণ দিয়ে থাকে।

কৃষিঋণ

ঋণের মাধ্যমে অর্থায়ন

(৩) বাণিজ্যিক ব্যাংক: স্বাধীনতার পর ব্যাংকব্যবস্থাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করার পর থেকে কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্যে ঋণদানের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সাধারণত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো উৎপাদনমুখী স্বল্পমেয়াদি ঋণ প্রদান করে। বর্তমানে দেশের অভ্যন্তরে ও দেশের বাইরে ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্প্রসারণে, আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে সহায়তা প্রদানে বাণিজ্যিক ব্যাংক সর্বাধিক অবদান রাখছে।

(৪) সমবায় সমিতি: সমবায় ঋণদান সমিতি কৃষিঋণের অন্যতম প্রধান উৎস। সাধারণত এ সমিতি কৃষকদেরকে স্বল্প, মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করে। সমবায় আন্দোলন এখনো দেশে তেমন প্রসার লাভ না করলেও বর্তমানে এর পুনর্গঠন ও সম্প্রসারণের ওপর বিশেষ জোর দেয়া হচ্ছে।

(৫) ভূমি বন্ধকি ব্যাংক: বাংলাদেশের সর্বত্র যে কয়েকটি ভূমি বন্ধকি ব্যাংক রয়েছে সেগুলো জমি বন্ধক রেখে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করে।

(৬) সরকার: সরকারও অনেক সময় বিশেষত বন্যা, খরা, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি কৃষকদেরকে সরাসরি ঋণ প্রদান করে। এ ঋণের সুদের হারও কম এবং পরিশোধ করার শর্তও সহজ।

কৃষিঋণ

ঋণের মাধ্যমে অর্থায়ন

অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস বা অনানুষ্ঠানিক উৎস

১. বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন: অনানুষ্ঠানিক উৎসের মধ্যে এটা একটা বড় উৎস। এ উৎস থেকে কৃষকেরা মোট কৃষিঋণের প্রায় ৯৩% পেয়ে থাকে। এ ঋণের জন্য কোনো জামানত নেই, মুনাফা বা সুদ দিলেও খুব কম।

২. গ্রাম্য ব্যবসায়ী ও দোকানদার: গ্রাম্য ব্যবসায়ী ও দোকানদারগণ কৃষকদের ফসল কম দামে বন্ধক রাখে, যা ফসল ওঠলেই তাদের নিকট বিক্রয়ে বাধ্য হয়-এরূপ অবস্থায় ঋণ প্রদান করে এবং কৃষকদেরকে প্রায় ২% থেকে ৩% ঋণের যোগান দিয়ে থাকে।

৩. গ্রাম্য মহাজন: এ উৎস কৃষকদেরকে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। কৃষকদের নিকট থেকে জমি, সোনার অলঙ্কার ও অন্যান্য দ্রব্যাদি জামিন রেখে চড়া সুদে ঋণ প্রদান করে। কিন্তু সুদের হার অধিক বলে অধিকাংশ কৃষক এ ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়।

কৃষিঋণ

বাংলাদেশের কৃষিঋণ ব্যবস্থার সমস্যাবলি

বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষিনির্ভর। কিন্তু এদেশের কৃষকরা অত্যন্ত দরিদ্র। তাই তারা কৃষিকার্য পরিচালনার জন্য ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু আমাদের দেশের কৃষিঋণ ব্যবস্থা আদৌ সন্তোষজনক নয়। নিম্নে কৃষিঋণ ব্যবস্থার ত্রুটিগুলো আলোচনা করা হলো:

১. অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণের ওপর অধিক নির্ভরশীলতা: বাংলাদেশে কৃষিঋণ ব্যবস্থা অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসগুলোর ওপর অধিক নির্ভরশীল।

২. প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের অভাব: প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের পরিমাণ আমাদের দেশে প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। এছাড়াও এ উৎস থেকে ঋণ পেতে হলে অনেক আনুষ্ঠানিকতা থাকায় অর্থাৎ ঋণ গ্রহণ প্রক্রিয়াটি সহজ না হওয়ায় কৃষককুল সহজে পাবার কারণে কঠিন শর্তযুক্ত অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণ গ্রহণ করে থাকে। এ উৎস প্রয়োজনীয় কৃষিঋণের ১৫ থেকে ২২ শতাংশ পূরণ করতে পারে।

৩. শহরভিত্তিক অবস্থান: প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের উৎসগুলো প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প এবং শহরভিত্তিক। গ্রামের সহজ-সরল দরিদ্র কৃষক শহরে এসে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের আনুষ্ঠানিকতাকে ভয় পায়।

কৃষিঋণ

বাংলাদেশের কৃষিঋণ ব্যবস্থার সমস্যাবলি

৪. ঋণদান পদ্ধতির জটিলতা: প্রাতিষ্ঠানিক উৎসের ঋণদান পদ্ধতি জটিল ও হয়রানিমূলক। এছাড়া এ উৎস থেকে ঋণ প্রাপ্তি সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।

৫. ঋণ বণ্টনে দুর্নীতি: আমাদের দেশে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ বণ্টনের ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি, জালিয়াতি ও দুর্নীতি রয়েছে। তাই এদেশের সরলপ্রাণ কৃষকের পক্ষে প্রাতিষ্ঠানিক কৃষিঋণ গ্রহণ করা রীতিমত দুঃসাধ্য।

৬. ঋণ প্রাপ্তিতে দুর্ভোগ: আমাদের দেশের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিগণ যেহেতু ঋণের জন্য জামানত দিতে পারে না, এ কারণে প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে তারা ঋণও পায় না।

৭. সংগ্রহ ব্যয়বহুল: প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সংগ্রহ করতে সময় ও ব্যয় পড়ে-বেশি। এছাড়া কর্মকর্তা কর্মচারীদেরকে ঘুষ দিতে হয়।

কৃষিঋণ

বাংলাদেশের কৃষিঋণ ব্যবস্থার সমস্যাবলি

৮. ভোগান্তি: প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আমলাতান্ত্রিক মনোভাবের জন্য কৃষকদের পক্ষে এ ঋণ গ্রহণ করতে মারাত্মক ভোগান্তির সম্মুখীন হতে হয়।

৯. তদারকির অভাব: আমাদের দেশে প্রদত্ত ঋণের কোনোরূপ তদারকির ব্যবস্থা নেই। ফলে যে উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করা হয় সে উদ্দেশে ব্যয় হয় না। এ কারণে কৃষিঋণ অনেক সময় কৃষির কাজে আসে না।

১০. শোষণ : অলিখিত দলিল, অযৌক্তিক ও আকাশচুম্বী সুদের হারের ফলে কৃষক সমাজকে চুষে ঋণদাতা ফুলে ফেঁপে ওঠে।

১১. উচ্চ সুদের হার: বিভিন্ন গবেষণা থেকে দেখা যায়, অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণের সুদের হার বার্ষিক প্রায় ৫০% থেকে ৩০০% হয়।

কৃষিঋণ

বাংলাদেশের কৃষিঋণ ব্যবস্থার সমস্যাবলি

১২. সমন্বয় সাধনের অভাব: বিভিন্ন ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ঋণদান কার্যক্রমে সুষ্ঠু সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। ফলে কৃষকদের ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে।

১৯৫৯ সালের 'Credit Enquiry Commission' এর মতে কৃষিঋণের পরিমাণ উৎপাদনের ২৫% হওয়া উচিত। কিন্তু বাংলাদেশে কৃষিঋণের প্রকৃত সরবরাহ যদি বিবেচনা করা হয়, তবে দেখা যাবে কৃষিঋণের মোট চাহিদার তুলনায় এর যোগান অনেক কম।

উপরিউক্ত কারণসমূহ ছাড়াও ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাংগঠনিক দুর্বলতা এবং সুষ্ঠুনীতির অভাবে বাংলাদেশের কৃষিঋণ সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হচ্ছে না।

কৃষিঋণ

বাংলাদেশে কৃষিঋণ সমস্যার সমাধান

বাংলাদেশের মতো জনবহুল দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশে যেখানে খাদ্য ও জীবনধারণের জন্য মানুষ প্রধানত কৃষির ওপর নির্ভরশীল সেখানে কৃষির কাঠামোগত পরিবর্তন ও আধুনিকায়নের জন্য কৃষকদের প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। কৃষকদের হাতে প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য সরকার প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান বা ব্যাংকসমূহকে উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে তাদের সেবা সম্প্রসারণে বাধ্য করতে পারে। নতুন ব্যাংকের অনুমোদন বা শাখা বৃদ্ধির সময় ইউনিয়ন বা গ্রামাঞ্চলে বেশির ভাগ শাখা স্থাপনের শর্ত আরোপ করতে পারে। এর ফলে কৃষকরা প্রাতিষ্ঠানিক উৎস হতে স্বল্পসুদে ঋণ বা সরকারের প্রেরিত বিভিন্ন ধরনের ভর্তুকি সুবিধা সহজেই পেতে পারে। বাংলাদেশের বেশিরভাগ কৃষকই ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষক। এদেরকে পর্যাপ্ত ক্ষুদ্র ঋণের যোগান দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান, এনজিও এবং সমবায়ভিত্তিক বাণিজ্যিক খামার গঠনের মাধ্যমে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে পারে। কৃষকদেরকে শুধু পর্যাপ্ত কৃষিঋণ বিতরণ করলেই চলবে না, ঋণ প্রদানকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে যথাযথ তদারকি করাও প্রয়োজন।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ২য় পত্র

অধ্যায় ০২ : বাংলাদেশের কৃষি

টপিক – ০৭ বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে সরকারের গৃহীত কর্মসূচী

বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে সরকারের গৃহীত কর্মসূচী

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে সরকারের গৃহীত কর্মসূচী

খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পাশাপাশি পুষ্টিমান সমৃদ্ধ নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং লাভজনক কৃষিব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এ লক্ষ্য পূরণে সরকার সময়োপযোগী নীতি, কর্মপরিকল্পনা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কৃষির উন্নয়ন ও কৃষকদের কল্যাণকে সর্বোচ্চ বিবেচনায় নিয়ে রূপকল্প ২০৪১, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, জাতীয় কৃষিনীতি ২০১৮, জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি ২০২০, জাতীয় কৃষি যান্ত্রিকীকরণ নীতিমালা ২০২০ দক্ষিণাঞ্চলে কৃষি উন্নয়নের মহাপরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, ডেল্টাপ্ল্যান ২১০০ এবং অন্যান্য পরিকল্পনা দলিলের আলোকে কৃষিখাতের সার্বিক উন্নয়নে সরকারের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

(i) প্রকৃত কৃষকদের নিকট খাস জমি প্রদান: বাংলাদেশের অনেক কৃষকের নিজস্ব জমি নেই। অন্যের জমিতে বর্গা চাষাবাদ করে অথবা শুধুমাত্র শ্রম বিক্রি করে। আবার যাদের নিকট প্রচুর কৃষিজমি রয়েছে, ভূ-স্বামী, তারা প্রকৃত চাষি নয়। এরূপ সমস্যায় কৃষির কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন হয় না। তাই সরকার এখন খাসজমি উদ্ধার করে প্রকৃত কৃষকদের হাতে ঐ জমি হস্তান্তরের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে সরকারের গৃহীত কর্মসূচী

(ii) কৃষিঋণ বিতরণ: বাংলাদেশের কৃষি ভরণপোষণ পর্যায়ে (Subsistence level) পরিচালিত হওয়ায় প্রয়োজনীয় উপকরণ হিসেবে কৃষিঋণ একটি ভিন্ন মাত্রার গুরুত্ব বহন করে। দেশের খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার তথা সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কৃষিখাত এবং পল্লি অঞ্চলের ভূমিকা সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে কৃষি ও পল্লি ঋণের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এ পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাংক ও অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে কৃষি ও পল্লি ঋণ বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। প্রান্তিক পর্যায়ে কৃষিঋণ কার্যক্রম আরও গতিশীল করতে সম্প্রতি বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকসহ বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংককে কৃষিঋণ কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার পাশাপাশি কৃষিঋণ বিতরণ সহজতর করে এবং নতুন নতুন বিষয় সনিবেশিত করে বর্ধিত কলেবরে কষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা ও কর্মসচি প্রণয়ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে সরকারের গৃহীত কর্মসূচী

(iii) কৃষি উপকরণ বিতরণ: শুধু কৃষিঋণ বিতরণই কৃষি উন্নয়নের একমাত্র কর্মসূচি নয়। কৃষি উপকরণ বিতরণ যেমন: কৃষি উপকরণে ভর্তুকি, উপকরণ সহজলভ্যকরণ, উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণসহ নানারূপ কর্মসূচি কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে বাস্তবায়িত হচ্ছে। যেমন:

সারাদেশে ইতোমধ্যে ২ কোটি ১০ লক্ষ কৃষককে 'কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড' প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে এটি আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। মাত্র ১০ টাকায় কৃষক ব্যাংক একাউন্ট খোলার সুযোগ পেয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় কৃষক পরিবারকে বিনামূল্যে সার ও বীজ সরবরাহ করা, বিনামূল্যে সার ও বীজ প্রদান করা হয়। একই সাথে কৃষকদের মাঝে ভর্তুকি মূল্যে পাওয়ার টিলার, ট্রাক্টরসহ বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়। এরূপ সুবিধা বর্তমান বাজেটেও অব্যাহত রাখা হয়।

দেশের জনগণের দীর্ঘমেয়াদি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় বিভিন্ন খাত ও উপখাত যেমন : কৃষি গবেষণা ও শিক্ষা-কার্যক্রম, কৃষি সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ; কৃষিপণ্যের বিপণন, কৃষি সহায়তা ও পুনর্বাসন; কৃষি উপকরণ ও যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন, সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা, বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ, সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন ও সেচ কার্যক্রম, শস্য সংরক্ষণসহ সামগ্রিক কৃষি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বহুমুখী উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে।

বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে সরকারের গৃহীত কর্মসূচী

(iv) কৃষি বীজ সহায়তা: ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের জন্য উন্নতমানের বীজ একটি অন্যতম প্রধান ও মৌলিক কৃষি উপকরণ। উন্নত জাতের বীজ সরবরাহের জন্য বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনকে শক্তিশালী করা হয়েছে।

ভালো বীজ এককভাবে ফসলের ফলন ১৫-২০ ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে সক্ষম। বর্তমানে বিভিন্ন ফসলের জন্য চাহিদামাফিক মানসম্মত বীজের উল্লেখযোগ্য অংশ সরকারিখাত থেকে সরবরাহ করা হয়। কিছু সংখ্যক বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান এবং এনজিও (NGO) ভালো বীজ, মূলত হাইব্রিড ধান, গম, ভুট্টা, আলু, ডাল, তৈল, পাট, সব্জি এবং মসলা বীজ সরবরাহের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

মানসম্মত বীজ সহজলভ্য করার জন্য 'সার্ক সীড ব্যাংক' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এছাড়া হাইব্রিড ধান চাষের আওতা বাড়ছে এবং কৃষিক্ষেত্রে শস্যবিমা প্রচলনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে সরকারের গৃহীত কর্মসূচী

(v) কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ: ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সরকার নেত্রকোণার আটপারা উপজেলায় এক কৃষক সমাবেশে কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ কর্মসূচি উদ্বোধন করেন। সরকার ইতোমধ্যে ছোট, বড়, মাঝারি, বর্গাচাষি, ভূমির মালিক এবং ধনী চাষিদের মধ্যে কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ করেছে। এ কার্ডে কৃষকের শনাক্তকারী নম্বর, কৃষকের নিজস্ব মোট জমির পরিমাণ, চাষকৃত জমির পরিমাপ, বিভিন্ন ঋতুতে আবাদকৃত ফসলের নাম, প্রয়োজনীয় বীজ ও সার সংক্রান্ত তথ্য সন্নিবেশিত থাকে।

দেশে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষকদের ভর্তুকি, কীটনাশক ওষুধ, অধিক ফলনশীল বীজ, উন্নতমানের প্রয়োজনীয় সার সরবরাহ ও বিনামূল্যে সরকার ঘোষিত সকল প্রকার পরামর্শসহ কৃষি উপকরণ সহায়তা নিশ্চিত করা, কৃষকদের আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া এবং অর্থের অপব্যবহার রোধ করা এ কর্মসূচির উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে সরকারের গৃহীত কর্মসূচী

(vi) সাম্প্রতিক সময়ে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ:

(ক) শস্যবিমা : প্রথমে হাওর এলাকার ৭ জেলাকে শস্যবিমার আওতায় আনা হলেও বর্তমানে এ সুবিধা অন্য জেলায়ও সম্প্রসারিত হচ্ছে। মাসিক কিস্তির মাধ্যমে এ বিমার কাজ চলে। এর ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসল নষ্ট হলে ক্ষতিপূরণ পাবে কৃষক।

(খ) কৃষি গবেষণাকে অগ্রাধিকার প্রদান, কৃষি যান্ত্রিকীকরণকে আরও গতিশীল করা, কৃষিজমির পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য পতিত জমি চাষাবাদের আওতায় আনার কার্যক্রমের বিস্তৃতি এবং মাটির স্বাস্থ্য রক্ষায় অজৈব সারের পাশাপাশি জৈব সারের

উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধির পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। দেশের সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় কৃষির সার্বিক উন্নয়ন সাধনের জন্য উপকূলীয় ১৪টি জেলায় একটি মহাপরিকল্পনার বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে সরকারের গৃহীত কর্মসূচী

(গ) ভুট্টা, ডাল, তৈলবীজ ও মসলার আবাদে সহায়তা ও চাষের জন্য ৪% হারে কৃষিঋণ বিতরণ করা হচ্ছে। ২০২০ সালে নভেল করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব এর ফলে কৃষিখাতে ক্ষতি পুষিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে সরকার কৃষি প্রণোদনা / ভর্তুকি ৫০০০ কোটি টাকা এবং সহজে কৃষিঋণ বাবদ ৯০০০ কোটি টাকা প্রদান করেছে।

(ঘ) বর্তমানে খাদ্যশস্যের সিংহভাগ উৎপাদিত হয় উত্তরাঞ্চলের বরেন্দ্রভূমিতে। খাদ্যশস্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া মোকাবেলায় বন্যা, লবণাক্ততা ও খরাপ্রবণ এলাকায় সহিষ্ণু ফসলের জাত উদ্ভাবনসহ ধানের আবাদ সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যেই উত্তরবঙ্গের মঙ্গা-পীড়িত অঞ্চলে সমন্বিত কৃষি কার্যক্রম গ্রহণের ফলে স্থায়িভাবে মন্দা দূর করা সম্ভব হয়েছে।

বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে সরকারের গৃহীত কর্মসূচী

(ঙ) জলাবদ্ধতা নিরসন, দক্ষিণাঞ্চলের ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ ও হাওর এলাকায় পানি নিষ্কাশনের মাধ্যমে আবাদি জমি সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি নদীতে রাবার ড্যাম স্থাপনের মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ ও ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি।

(চ) কৃষক যাতে তাঁর উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য পান, সে লক্ষ্যে কৃষি বিপণন দল, কৃষক ক্লাব, গ্রোয়ার্স মার্কেট, পাইকারি বাজার এবং এ্যাসেম্বল সেন্টার ও কৃষক দল গঠন করা হয়েছে। জেলা পর্যায়ের বিপণন অফিসগুলোকে ইন্টারনেট সংযোগের আওতাভুক্ত করার লক্ষ্যে ওয়েব সাইট www.dam.gov.bd তে প্রচার ও পরিবীক্ষণ করা হচ্ছে।

(ছ) ইতোমধ্যে কৃষিতে 'জীবন রহস্য' (Genome Sequencing) আবিষ্কারের মাধ্যমে কৃষি গবেষণায় যুগান্তকারী সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এ লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল আইন, ২০১২' কৃষি গবেষণাকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করবে। ২০০৮-০৯ অর্থবছর হতে ২০২৩ পর্যন্ত বিআরআরআই (BRRI) কর্তৃক ধানের ১১৫টি জাত, বিএআরআই (BARI) কর্তৃক বিভিন্ন ফসলের ৬৫২টি জাত, বিজেআরআই (BJRI) কর্তৃক পাটের ২০টি জাত, বিএসআরআই (BSRI) কর্তৃক ইক্ষুর ৪৬টি জাত, সিডিবি (CDB) কর্তৃক তুলার ১৭টি জাত এবং বিআইএনএ (BINA) কর্তৃক বিভিন্ন ফসলের ১১৯টি জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে।

বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে সরকারের গৃহীত কর্মসূচী

(জ) ভিডিও কনফারেন্স ও এসএমএস-এর মাধ্যমে কৃষককে তার সমস্যার সমাধান দ্রুততম সময়ে পৌঁছে দেয়ার জন্য ই-কৃষি যেমন-কৃষকের জানালা, কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা, কৃষি বাতায়ন, বন্ধু ফোন, Online Fertilizer Recommendation Software, Bangladesh Rice Knowledge Bank; কৃষি কল সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে কৃষি তথ্য কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (Agriculture Information and Communication Centre-AICC) স্থাপন করা হয়েছে।

বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে সরকারের গৃহীত কর্মসূচী

(vii) শস্যবহুমুখীকরণ (Crop Diversification): প্রাকৃতিক দুর্যোগ-কবলিত, দরিদ্র, জনবহুল এবং খাদ্য ঘাটতির দেশ বাংলাদেশ। বিদ্যমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষিজোতে সনাতনী পন্থায় চাষাবাদের মাধ্যমে উৎপাদন করে পুষ্টিকর, স্বাস্থ্যসমৃদ্ধ ব্যাপক খাদ্য চাহিদা পূরণ কখনো সম্ভব নয়। তাই বিগত দুই দশক যাবৎ বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে ঘটেছে নীরব বিপ্লব-শস্যবহুমুখীকরণ (Crop diversification)। অর্থাৎ একই জমিতে বার বার একই ফসল না চাষ করে ভিন্ন ভিন্ন শস্য উৎপাদন করলে জমির উর্বরতা এবং ফসল উৎপাদন দুটিই বৃদ্ধি পায়। এরূপ চাষাবাদ করাই হলো শস্যবহুমুখীকরণ। একই ফসল ক্রমাগত একই জমিতে চাষের ফলে জমির উৎপাদিকাশক্তি বা নির্দিষ্ট রাসায়নিক উপাদান নিঃশেষ হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ফসল যেমন- ধানের পর পাট, এরপর ডাল, সরিষা, আখ, শাক-সবজি ইত্যাদি চাষাবাদ করলে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। উন্নত দেশসমূহে এরূপ ফসল উৎপাদন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। অতএব, একই জমি বা কৃষিজোতে বিভিন্ন মৌসুমে এক ফসলের পরিবর্তে ভিন্ন ভিন্ন ফসল উৎপাদন করার প্রক্রিয়াকে শস্যবহুমুখীকরণ বলে। ধান, গম, আলু, মিষ্টি আলু, সবজি, আখ, পাট প্রভৃতি ক্ষেত্রে বহুমুখীকরণের ফলে বর্তমানে কৃষিক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। জাতীয় কৃষিনীতি ২০১১* তে শস্যবহুমুখীকরণের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। শস্যবহুমুখীকরণের ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নিম্নোক্ত প্রভাব (Impact/Importance) লক্ষ্য করা যায়-

বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে সরকারের গৃহীত কর্মসূচী

(ক) উৎপাদন বৃদ্ধি: কৃষিতে শস্যবহুমুখীকরণের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। জনবহুল দেশে ব্যাপক খাদ্য চাহিদা পূরণে এটি সহায়ক।

(খ) পুষ্টিকর খাদ্যের নিশ্চয়তা: শস্যবহুমুখীকরণের মাধ্যমে পুষ্টিমান সমৃদ্ধ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, সুষম খাদ্যের সংস্থান হবে।

(গ) আয় বৃদ্ধি: কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী তথা কৃষকদের আয় বৃদ্ধি পাবে।

(ঘ) পারস্পরিক চাহিদা সৃষ্টি: একাধিক ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণির ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে বিভিন্ন প্রকার পণ্যদ্রব্যের পারস্পরিক চাহিদা সৃষ্টি হবে। কেউ ধান-চাল ক্রয় করবে, কেউ ডাল, পেঁয়াজ, মরিচ ক্রয় করবে।

(ঙ) মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি: শস্যবহুমুখীকরণের মাধ্যমে মাটির গুণাগুণ, উর্বরতা শুধু ধরে রাখা নয়, বৃদ্ধিও করা যায়। তাই জনবহুল বাংলাদেশে শস্যবহুমুখীকরণ একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় হিসেবে বিবেচিত।

বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে সরকারের গৃহীত কর্মসূচী

(চ) নিবিড় চাষাবাদ : শস্যবহুমুখীকরণের ফলে একই ফসল বার বার উৎপাদন না করে বিভিন্ন ফসল বিভিন্ন সময়ে উৎপাদন করা হয়। ফলে সমগ্র বছরব্যাপী উক্ত জমিতে নিবিড় চাষাবাদ চলে এবং মোট উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়।

(ছ) চাহিদার বিভিন্নতা: মানুষের জীবন একটিমাত্র দ্রব্য দ্বারা অতিবাহিত করা যায় না, বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যসামগ্রী তার জীবনে প্রয়োজন। চাহিদার এ বিভিন্নতা পূরণে শস্যবহুমুখীকরণ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

(জ) কৃষিনির্ভর শিল্পের বিকাশ: শস্যবহুমুখীকরণের ফলে বিভিন্ন প্রকার কৃষিজ পণ্যের মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। চাহিদা পূরণের পর উদ্বৃত্ত পণ্য কৃষিনির্ভর শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হবে এবং শিল্পের বিকাশ সাধন করবে।

(ঝ) ঝুঁকি হ্রাস: বাংলাদেশে প্রায় বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ লেগেই থাকে, এতে ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং খাদ্যসংকট সৃষ্টি হতে পারে। শস্যবহুমুখীকরণের ফলে বিভিন্ন প্রকার উৎপাদনের মাধ্যমে এরূপ ঝুঁকি হ্রাস করা যায়।

(ঞ) কর্মসংস্থান: একাধিক ফসল ফলানোর কারণে অধিক উৎপাদনের ফলে এ প্রক্রিয়ায় দ্রুত কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবস্থাপনা ও বাজারজাতকরণ কার্যক্রমে অধিক শ্রমের কর্মসৃজন হয়।

বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে সরকারের গৃহীত কর্মসূচী

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পানি সেচের গুরুত্ব/প্রয়োজনীয়তা

কৃষিপণ্য উৎপাদনে সেচের পানি খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসেবে বিবেচিত। সরকারিভাবে ষাটের দশকের গোড়ার দিকে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করার পর দ্রুত সেচের অধীনে জমির পরিমাণ অর্থাৎ সেচকৃত এলাকা বাড়তে থাকে। নিম্নে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পানি সেচের গুরুত্ব/প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করা হলো:

(১) প্রকৃতির ওপর নির্ভরতা হ্রাস: বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষিনির্ভর এবং অধিকাংশ মানুষ কৃষিজীবী। এ কৃষিব্যবস্থা প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টির হাত থেকে কৃষিকে রক্ষার জন্য সেচব্যবস্থার প্রয়োজন অপরিসীম, এতে প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পায়।

(২) উচ্চ ফলনশীল ধান ও গম চাষ: বর্তমানে বাংলাদেশে উচ্চ ফলনশীল ধান ও গম চাষাবাদ করা হচ্ছে। এর জন্য প্রয়োজন সময়মতো প্রয়োজনমাফিক পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা।

(৩) একাধিক ফসল উৎপাদন: পানি সেচব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন সম্ভব হলে, একই জমিতে বছরে দুই বা ততোধিক ফসল চাষ করা সম্ভব। এতে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পানি সেচের গুরুত্ব/প্রয়োজনীয়তা

(৪) শীতকালীন ফসল উৎপাদন: বাংলাদেশে শীতকালে প্রায়ই বৃষ্টিপাত হয় না। ফলে কৃষিকাজ খুব ধীরগতিতে চলে। এ সময়ে পানি সেচের ব্যবস্থা করা হলে ইরি, বোরোসহ বিভিন্ন ধরনের রবিশস্য, যেমন- গম, ডাল, পিঁয়াজ, তামাক, রসুন প্রভৃতি ফসল ভালো হয়।

(৫) পানি নিষ্কাশনে সুবিধা: বাংলাদেশে বর্ষাকালে নিচু জমিগুলো জলমগ্ন থাকে। উপযুক্ত সেচব্যবস্থার দ্বারা এসব জমির পানি নিষ্কাশন করে সেখানে বিভিন্ন ধরনের ফসলের চাষ করা যেতে পারে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পানি সেচের গুরুত্ব/প্রয়োজনীয়তা

(৬) ফসলের প্রয়োজন অনুসারে পানি সরবরাহ: বিভিন্ন ধরনের ফসল উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পরিমাণ পানির প্রয়োজন হয়। পানি সেচের মাধ্যমে তা সন্তোষজনকভাবে করা যেতে পারে।

(৭) জমির উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি: নিয়মিত পানি সেচব্যবস্থা পরিচালিত করা হলে জমির অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়, এতে জমির উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

(৮) অধিক কর্মসংস্থান: পানি সেচব্যবস্থার মাধ্যমে জমিতে প্রায় সারা বছরই কোনো না কোনো কৃষিকাজ করা যায়। এতে অধিক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

(৯) জাতীয় আয় বৃদ্ধি: বাংলাদেশে মোট জাতীয় উৎপাদনের প্রায় ১১ ভাগ কৃষিখাত থেকে আসে। পানি সেচের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হলে জাতীয় আয় আরো বৃদ্ধি পাবে।

(১০) আমদানি ব্যয় হ্রাস: প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ খাদ্য ঘাটতি মোকাবেলার জন্য প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে খাদ্য আমদানি করতে হয়। যদি সময়মতো পানি সেচের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়, তবে আমদানি ব্যয় হ্রাস পাবে।

(১১) জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন: সেচব্যবস্থার ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি হলে কৃষকদের আয় বৃদ্ধি পাবে, কৃষিতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে, উৎপাদন ও ভোগ বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে জীবনযাত্রার মানও উন্নত হবে।

বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে সরকারের গৃহীত কর্মসূচী

বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচির উপযোগিতা

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এককভাবে কৃষি সবচেয়ে বড় খাত, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চালিকা শক্তি। কৃষির অগ্রগতির সাথে বাংলাদেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। এ লক্ষ্যে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধিসহ কৃষিখাতের সার্বিক উন্নয়নকে সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। কৃষিখাতের সার্বিক উন্নয়নের জন্য কৃষিঋণের প্রসার, ক্ষুদ্রসেচ সম্প্রসারণ, জলাবদ্ধতা নিরসন, উন্নতমানের ও উচ্চফলনশীল বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির উপযোগিতা (Utilization) নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

(i) কৃষি ও পল্লি ঋণ: সরকার বাংলাদেশের কৃষকদের সক্ষমতা সৃষ্টি, উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় মূলধনের সংস্থানের লক্ষ্যে নিরবচ্ছিন্ন কৃষিঋণ বিতরণ অব্যাহত রেখেছে। বিশ্বব্যাংকসহ বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠীর পরামর্শ উপেক্ষা করে ক্রমাগত কৃষি ও পল্লি ঋণের সম্প্রসারণ করে যাচ্ছে সরকার। এ পদক্ষেপের সুফল পেয়েছে বাংলাদেশের কৃষক ও জনগণ।

বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচির উপযোগিতা

(ii) প্রান্তিক ও ভূমিহীন কৃষক: পূর্বে বিত্তবান কৃষকরা সরকারের যাবতীয় সুবিধা গ্রহণ করতো। কিন্তু বর্তমানে প্রান্তিক ও ভূমিহীন কৃষকরাই সহজে কৃষিঋণ, উপকরণ সহায়তা, ভর্তুকি, সার, কীটনাশক সব সুবিধা পাচ্ছে। অর্থাৎ সরকারি সহায়তার আওতা ব্যাপকভাবে বাড়ানো হয়েছে।

(iii) খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি: সরকার কৃষিবান্ধব বাজেট প্রণয়নের ফলে সামষ্টিক অর্থনীতিতে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। খাদ্যশস্য উৎপাদন ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৮০/৮১ সালে যেখানে খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়েছিল মোট ১৪৯.৭লক্ষ মেট্রিক টন, সেখানে প্রতি বছর কৃষিভূমির পরিমাণ হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও ২০১৯-২০ এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে যথাক্রমে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে ৪৫৩.৪৪ এবং ৪৬৭.০৪ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে।

বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচির উপযোগিতা

(iv) কর্মসংস্থান বৃদ্ধি: কৃষকদেরকে মূলধন সরবরাহের ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। শিল্পের কাঁচামালের যোগানও বৃদ্ধি পাওয়ায় শিল্প উৎপাদনও বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ, শিল্পের কাঁচামালের যোগান বেশির ভাগই কৃষি প্রদান করে থাকে। ফলে দেশে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে, বেকারত্ব হ্রাস পেয়েছে।

(v) মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি: উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু আয় পূর্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। মাথাপিছু আয় ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশের মানুষের জীবনযাত্রার মানও পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে।

(vi) দারিদ্র্যের হার হ্রাস: উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশে বর্তমানে দারিদ্র্যের হার পূর্বাপেক্ষা অনেক হ্রাস পেয়েছে। ১৯৯১/৯২ সালে পল্লি অঞ্চলে দারিদ্র্যের ঊর্ধ্বসীমা ৪৭.৮, নিম্নসীমা ২৮.৩ শতাংশ ছিল যা ২০২২ সালের হিসাব অনুযায়ী যথাক্রমে ১৮.৭ এবং ৫:৬ শতাংশে হ্রাস পায়।

(vii) গড় আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি: সরকারের গৃহীত কর্মসূচির ফলে সামষ্টিক অর্থনীতি দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথ সুগম হয়েছে। এর পরোক্ষ ফল হলো দেশের জনগণের গড় আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯৬ সালের হিসাব অনুযায়ী গড় আয়ুষ্কাল পুরুষ ৬০.০০, মহিলা ৫৯.০ যা ২০২৩ সালের হিসাবে যথাক্রমে ৭০.৮ ও ৭৩.৮ এ উন্নীত হয়।

বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচির উপযোগিতা

(viii) সময়ের দাবি-উদ্ভাবন**: সরকার ব্যাপক জনগণের খাদ্য চাহিদা মেটানোর জন্য উচ্চফলনশীল বীজ উদ্ভাবন, কৃষির বহুমুখীকরণ, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অভিযোজন করতে পারে এরূপ ফসলের জাত উদ্ভাবনের মাধ্যমে সময়ের দাবি পূরণে সচেষ্ট।

ইতোমধ্যে বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশনের (BJMC) প্রধান বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা অধ্যাপক মোবারক আহমদ খান পাটের আঁশ থেকে পলিমার তৈরির মাধ্যমে (২০১৫ সালে) টেকসই ও মজবুত পরিবেশবান্ধব পলিথিন ব্যাগ, পাটের সঙ্গে পলিমারের মিশ্রণ ঘটিয়ে মজবুত, তাপ বিকিরণরোধী ও সাশ্রয়ী ঢেউটিন "জুটিন' (২০০৯ সালে) উদ্ভাবন করেন।

(ix) সচেতন কৃষক: সরকার কৃষিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে কৃষকসমাজকে অনেক সচেতন করেছে। ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা, লবণাক্ততা বা পানিশূন্যতা (মরুময়তা) প্রভৃতি সময়ে কৃষক স্ব-উদ্যোগে সিদ্ধান্ত গ্রহণে, সমস্যা লাঘবে পূর্বাপেক্ষা বর্তমানে অনেক বেশি সামর্থ্যবান। তবে, নব্বই দশকের পর থেকে দেশে ব্যাপক বেসরকারিকরণের ফলে কৃষিতেও বাণিজ্যিকীকরণের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ফলে মধ্যস্বত্বভোগী, বিত্তবান কৃষকরা আধিপত্য কায়েম করেছে। আবাসনের কারণে আবাদি জমি হ্রাস পাচ্ছে। পরিবেশবান্ধব পণ্য পাটের উৎপাদন ও মান উন্নয়নে বাস্তব কর্মসূচির অভাব রয়েছে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ২য় পত্র

অধ্যায় ০২ : বাংলাদেশের কৃষি

টপিক – ০৮ কৃষি ও পরিবেশ

কৃষি ও পরিবেশ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

কৃষি ও পরিবেশ

বৈচিত্র্যময় ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম 'জীববৈচিত্র্যসমৃদ্ধ একটি দেশ। তবে অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতোই বাংলাদেশেও পরিবেশগত উন্নয়ন একটি বড় চ্যালেঞ্জ। যেহেতু অর্থনৈতিক কার্যাবলি এখনও কৃষিসহ দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল, সেহেতু কৃষিসহ গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরসমূহের জিডিপি-তে অবদান টেকসই ও উন্নত পরিবেশ (quality of environment) দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত হয়। টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিবেশ পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হওয়ায়, পরিবেশ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিকে উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সমন্বিত করার বিষয়টি গুরুত্ব পাচ্ছে।

আমাদেরকে পরিবেশ দূষণ, বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়সমূহ কী, কীভাবে এগুলো সংঘটিত হচ্ছে এর প্রভাব এবং প্রতিকারের উপায় নিয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন। নিম্নে প্রবাহ চিত্রের সাহায্যে ধারণাটি প্রদান করা হলো:

কৃষি ও পরিবেশ

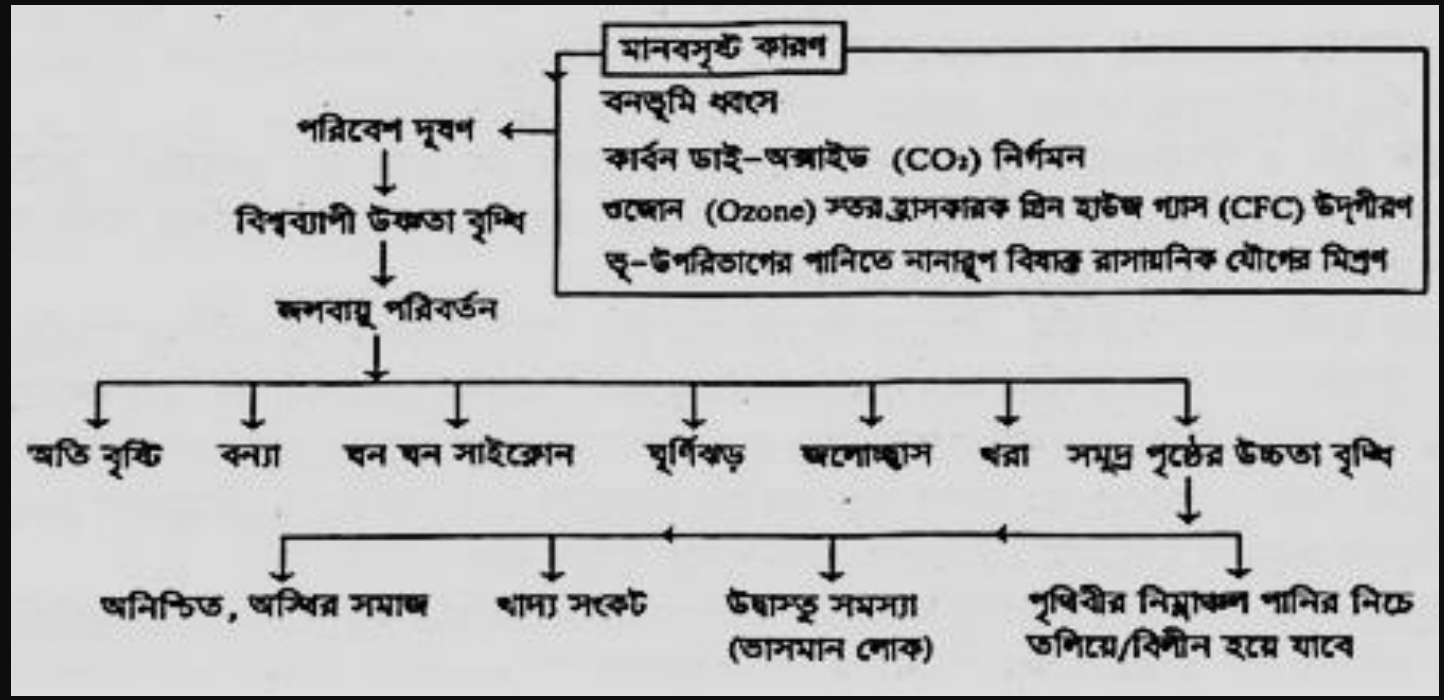
মানবসৃষ্ট কারণ
বনভূমি ধ্বংস
কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) নির্গমন
ওজোন (Ozone) স্তর হ্রাসকারক ক্লিন হাউজ গ্যাস (CFC) উদ্গীরণ
ভূ-উপরিভাগের পানিতে নানারূপ বিষাক্ত রাসায়নিক যৌগের মিশ্রণ
পরিবেশ দূষণ
বিশ্বব্যাপী উষ্ণতা বৃদ্ধি
জলবায়ু পরিবর্তন
অতি বৃষ্টি
বন্যা
ঘন ঘন সাইক্লোন
ঘূর্ণিঝড়
অনাবৃষ্টি
খরা
সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি
অনিশ্চিত, অস্থির সমাজ
খাদ্য সংকট
উদ্বাস্তু সমস্যা
(ভাসমান লোক)
পৃথিবীর নিম্নাঞ্চল পানির নিচে
তলিয়ে/বিলীন হয়ে যাবে

কৃষি ও পরিবেশ

প্রবাহ চিত্র হতে বোঝা যায়, মানুষই পরিবেশ দূষণের জন্য দায়ী। বনভূমি ধ্বংস, কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) নির্গমন, CFC গ্যাস নির্গমন, পরিবেশের প্রতি হুমকিস্বরূপ প্লাস্টিক ও পলিথিন** সামগ্রী ব্যবহার, পানিতে আর্সেনিক*** বিষের মিশ্রণ, শব্দ দূষণ, অপরিকল্পিত নগরায়ন, মারণাস্ত্র উৎপাদন ও ব্যবহার ইত্যাদির ফলে মানুষ নিজেই পরিবেশ বিপর্যয় ঘটাচ্ছে। এর ফলে বিশ্বব্যাপী সৌর তেজস্ক্রিয়তার দ্বারা উষ্ণতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম বিরূপ প্রভাব হচ্ছে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি। গত ১০০ বছরে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়েছে ১০ থেকে ২৫ সেন্টিমিটার। সমুদ্র উপকূল এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট প্রতিকূল প্রভাবগুলোর কারণে বাংলাদেশ নাজুক পরিস্থিতির শিকার। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, ঝুঁকিসমূহ ও বিপন্নতা অভিযোজন এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ব্যাপারে সমীক্ষা ও মূল্যায়নের ফলে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, বাংলাদেশ হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সারা বিশ্বের

সবচেয়ে বেশি বিপন্ন ও ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর অন্যতম। বাংলাদেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নাজুক অর্থনীতি এবং প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর অধিক নির্ভরশীলতা এ বিপন্নতা বাড়িয়ে দিয়েছে। বন্যা, খরা, সাইক্লোন, লবণাক্ততা এবং সমুদ্রতলের উচ্চতা বৃদ্ধি আমাদের জাতীয় প্রবৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করছে। জলবায়ু পরিবর্তন গবেষণার আন্তর্জাতিক সংস্থা 'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)' এর মতে, বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান কারণ পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি। বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অতিবৃষ্টি, বন্যা, সাইক্লোন, খরাসহ সমুদ্রপৃষ্ঠের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ কারণে পৃথিবীর নিম্নাঞ্চল, দ্বীপদেশসমূহ পানিতে তলিয়ে যাবে, উদ্বাস্তু সমস্যা, খাদ্য সংকটসহ বিভিন্ন প্রকার সামাজিক অস্থিরতা তৈরি হবে।

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য দায়ী সর্বোচ্চ গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমনকারী দেশসমূহ :

দেশ	বার্ষিক মোট গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ, ২০১৯ (মিলিয়ন মেট্রিক টন)	শতকরা নিঃসরণ
১. চীন	১২,৭৫০.১	২৬.৪০
২. যুক্তরাষ্ট্র	৬০০১.২	১২.৪৭
৩. ভারত	৩৩৯৪.৯	৭.০৫
৪. ইউরোপ	৩৩৮৩.৪	৭.০৩
৫. রাশিয়া	২৪৭৬.৮	৫.১৪
৬. জাপান	১১৬৬.৫	২.৪২

উৎস : CAIT Climate Data Explorer–March 2023, World Resource Institute

বাংলাদেশের কৃষিতে পরিবেশ দূষণ, বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব

বাংলাদেশের কৃষিতে পরিবেশ দূষণ, বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাবে নিম্নোক্ত সমস্যার উদ্ভব হবে:

১. সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি: বিশেষজ্ঞদের মতে বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পায়। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা গত ১০০ বছরে ১০ থেকে ২৫ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পেয়েছে। উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে এ শতকেই বঙ্গোপসাগরের পৃষ্ঠের উচ্চতা প্রায় ১ মিটার বৃদ্ধি পাবে বলে গবেষণায় প্রকাশিত হয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশের নিচু ও উপকূলীয় এলাকা তলিয়ে যাবে।

২. প্রাকৃতিক দুর্যোগ: বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশে প্রায় অতি বৃষ্টি, বন্যা, সাইক্লোন, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, খরা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ লেগে আছে। এর ফলে কৃষি উৎপাদন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৩. উৎপাদন হ্রাস: পরিবেশ দূষণ, জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি কারণে কৃষি উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়ে উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে। এর ফলে শস্য, প্রাণিজ, বনজ ও মৎস্য সম্পদ প্রভৃতি উপখাত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

বাংলাদেশের কৃষিতে পরিবেশ দূষণ, বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব

৪. লবণাক্ততার হার বৃদ্ধি: সমুদ্রপৃষ্ঠের পানির উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে স্থলভাগে লবণাক্ততার হার বৃদ্ধির সম্ভাবনা বেড়ে যায়। ইতোমধ্যে দক্ষিণাঞ্চল হতে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের দিকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার অভ্যন্তরে সমুদ্রের লোনা পানি প্রবেশ করে লবণাক্ততার হার বৃদ্ধি করছে ফলে কৃষি উৎপাদনও ব্যাহত হচ্ছে।

৫. কৃষিভূমি হ্রাস: সমুদ্রপৃষ্ঠের পানির উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশের নিম্নাঞ্চল তলিয়ে যেতে পারে, তখন আবাদযোগ্য কৃষিভূমি হ্রাস পাবে।

বাংলাদেশের কৃষিতে পরিবেশ দূষণ, বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব

৬. খাবার পানির সংকট: বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে লবণাক্ততার হার বৃদ্ধি এবং উত্তরাঞ্চলে মরুকরণ-এর ফলে খাবার পানির সংকট সৃষ্টি হবে।

৭. চাষাবাদ ব্যাহত: বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে খরার কারণে জমি চাষাবাদ করা যাবে না।

৮. খাদ্য সংকট: জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে জনবহুল বাংলাদেশে উৎপাদন হ্রাসের ফলে খাদ্য সংকট চরম আকার ধারণ করবে।

৯. নদীর প্রবাহ পরিবর্তন: সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে পর্বতের বরফ দ্রুত গলে যাওয়ার ফলে বাংলাদেশের নদী, উপনদীগুলোর প্রবাহ পরিবর্তিত হচ্ছে। অনেক নদী নাব্যতা হারাচ্ছে বা শুকিয়ে যাচ্ছে।

১০. অজানা রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি: জমিতে কীটনাশক প্রয়োগ, কৃষিতে প্রযুক্তির ব্যবহার, তেজস্ক্রিয়তা, পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা ইত্যাদি বহুবিধ কারণে মানুষসহ প্রাণিকুলে নতুন অজানা রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১১. জীববৈচিত্র্য ধ্বংস: পরিবেশ দূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ইকোসিস্টেম তথা সামগ্রিক ভারসাম্য বিনষ্ট হয়ে উদ্ভিদ ও প্রাণিকুল ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়ছে।

বাংলাদেশের কৃষিতে পরিবেশ দূষণ, বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব

সংকট উত্তরণ এবং অভিযোজন (adaptation) এর উপায়: ডিসেম্বর ২০০৯ এ ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সম্মেলনে ১৯৪টি দেশ, অসংখ্য পরিবেশবাদী সংগঠন এবং বিশেষজ্ঞরা অংশগ্রহণ করে 'কোপেনহেগেন সমঝোতা' নামে এক চুক্তি স্বাক্ষর করে। এ সম্মেলনে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নামিয়ে আনা এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রয়োজন মেটাতে ২০২০ সাল পর্যন্ত উন্নত দেশগুলো যৌথভাবে প্রতি বছর ১ হাজার কোটি ডলার দেয়ার সুপারিশ করে।

বাংলাদেশের কৃষিতে পরিবেশ দূষণ, বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব রোধে কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে ডিসেম্বর ২০১০ এ কানকুনে অনুষ্ঠিত Conference of the Parties 16 (COP-16) এ কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

(i) অভিযোজন (adaptation) কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের জন্য Adaptation Committee গঠন;

(ii) যেসব দেশে ১০টিরও কম Clean Development Mechanism (CDM) প্রকল্প আছে এরূপ দেশগুলোকে সহায়তা এবং ঋণ প্রদান-এর মাধ্যমে দেশের পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনগুলোর জৈব আবর্জনার দূষণ রোধ করতে হবে।

(iii) কানকুন সম্মেলনের অন্যতম সাফল্য হচ্ছে Green Climate Fund প্রতিষ্ঠা। কারণ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলা ও অভিযোজন কর্মসূচি ত্বরান্বিত করার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ দরকার।

(iv) COP-16 এর Annex I ভুক্ত উন্নত দেশসমূহ ২০১০-১১ মেয়াদে প্রতিশ্রুত ৩০ বিলিয়ন অর্থ উন্নয়নশীল দেশসমূহকে অভিযোজন এবং প্রশমন খাতে প্রদান;

বাংলাদেশের কৃষিতে পরিবেশ দূষণ, বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব

(v) উন্নত দেশ কর্তৃক দীর্ঘমেয়াদে ২০২০ সাল হতে ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সরবরাহ করা।

(vi) বাংলাদেশ বৈশ্বিক উষ্ণতা (Global warming) বৃদ্ধির জন্য কোনোভাবেই দায়ী নয়। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের এক নির্দোষ শিকার (Innocent Victim)। সে কারণে উন্নত দেশগুলোর নিকট হতে ন্যায্য হিস্যা বা পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে ক্লাইমেট চেঞ্জ নেগোশিয়েশন টিম গঠন করা হয়েছে এবং নেগোশিয়েশনের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

(vii) বাংলাদেশের বিভিন্ন শিল্প কল-কারখানার নির্গত বর্জ্য হ্রাস করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়া পরিবেশবান্ধব উপায়ে বর্জ্যের পুনঃব্যবহারের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। তীব্র দূষণ সৃষ্টিকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে Effluent Treatment Plant (ETP) স্থাপন করার পরই পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা প্রয়োজন।

(viii) বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, মাত্রা প্রভৃতি কীরূপ তা নির্ণয়ের জন্য পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।

(ix) দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) নিঃসরণ উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাসের কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

বাংলাদেশের কৃষিতে পরিবেশ দূষণ, বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব

(x) সারাদেশের অসংখ্য ইটের ভাটা থেকে সৃষ্ট মারাত্মক বায়ু দূষণ হ্রাসের লক্ষ্যে সরকার বিদ্যমান সনাতন ইটের ভাটাসমূহকে জ্বালানি সাশ্রয়ী উন্নত প্রযুক্তিতে রূপান্তর করতে হবে। ইতোমধ্যে সনাতন ইটের ভাটার অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। পরিবেশবান্ধব ইটভাটা স্থাপনের জন্য 'ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩' প্রণয়ন করা হয়েছে। বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত জ্বালানির গুণগত মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ, শিল্পকারখানায় বায়ু দূষণ রোধক যন্ত্রপাতি স্থাপনে বাধ্য করা এবং বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য আরও কঠোর আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

xiii) দেশে একটি সুস্থ ও পরিবেশবান্ধব পরিবেশ গড়ার লক্ষ্যে গণসচেতনতামূলক এবং পরিবেশ সংরক্ষণে অংশীদারিত্বমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা আবশ্যক। অবশ্য ইতোমধ্যে দেশে পরিবেশ সংবেদনশীল প্রজন্ম সৃষ্টির প্রত্যয় নিয়ে ইউনেস্কোর আর্থিক সহায়তায় ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে 'গ্রিন ক্লাব' (Green Club) প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের কৃষিতে পরিবেশ দূষণ, বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব

(xiv) ইকোসিস্টেমকে সচল ও উৎপাদনমুখী রেখে নদী আমাদের দেশের ভূ-প্রাকৃতিক সৌন্দর্য রক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ঢাকার পারিপার্শ্বিক নদীসমূহে পানির গুণগতমান গ্রহণযোগ্য সীমার ভেতরে রাখার লক্ষ্যে নদীর পানিতে বর্জ্য ফেলার কারণে যে দূষণ ঘটছে তা অনতিবিলম্বে রোধের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

(xv) পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, ঘূর্ণিঝড়ের প্রকোপ হ্রাস এবং সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীতে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম একটি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম যা গ্রামীণ জনপদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্যবিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

(xvi) জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ দূষণ মোকাবেলায় শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমই যথেষ্ট নয়, পাশাপাশি স্থানীয় সরকারসহ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোর অভিযোজন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ জরুরি।

বাংলাদেশের কৃষিতে পরিবেশ দূষণ, বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব

(xvii) জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে বা খাদ্য সংকট দূরীকরণে পরিবেশবান্ধব কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা প্রয়োজন। যেমন- লবণাক্ততা, মরুময়তা, অধিক পানি ইত্যাদিতে অভিযোজনে সক্ষম ধানসহ ফসলি বীজ উদ্ভাবন ও চাষাবাদ করা প্রয়োজন।

(xviii) বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ দেশ। প্রতি বছর কোনো না কোনো দুর্যোগে এদেশের মানুষের জানমালের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সার্বিক সক্ষমতা শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে জনগণ বিশেষ করে দরিদ্র ও দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি হ্রাস এবং বড় মাত্রার দুর্যোগ

বাংলাদেশের কৃষিতে পরিবেশ দূষণ, বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব

(xix) দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত স্থানীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন উন্নয়নসহযোগীদের মধ্যে সমন্বয়সাধন, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রয়োজন। একটি যুগোপযোগী ও সমন্বিত সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার আওতায় ঝুঁকি হ্রাস ও প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

(xx) ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে দুর্যোগবিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধ্যায় সংযুক্ত করা হয়েছে।

(xxi) দুর্যোগ পূর্ববর্তী সতর্কীকরণ সংকেত এবং জরুরি সাড়া প্রদান কার্যক্রম যেমন- মোবাইল ফোনের মাধ্যমে দুর্যোগ বার্তা, SMS, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র ইত্যাদির মাধ্যমে ক্ষতি হ্রাস করা যায়।

বাংলাদেশের কৃষিতে পরিবেশ দূষণ, বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব

পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন

পরিবেশগত সমস্যাসমূহ মোকাবেলার লক্ষ্যে পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়টি সরকারের বিভিন্ন নীতি এবং উন্নয়ন পরিকল্পনায় গুরুত্বসহকারে বিবেচিত হচ্ছে। যেমন এ লক্ষ্যে সরকারের অংশীদারিত্বমূলক কার্যক্রম গ্রহণ, শিল্প দূষণ নিয়ন্ত্রণ, ওজোনস্তর সুরক্ষায় ব্যবস্থা গ্রহণ, বায়ু ও নদ-নদীর পানি দূষণ রোধ এবং সামাজিক বনায়ন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি খাতওয়ারি নীতিমালা ও পরিকল্পনায় বিষয়গুলোকে সমন্বিত করা শুরু হয়েছে। এ লক্ষ্যে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ও এর সংস্থাসমূহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ২য় পত্র

অধ্যায় ০২ : বাংলাদেশের কৃষি

টপিক – ০৯ বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে গৃহীত ব্যবস্থাদি

বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে গৃহীত ব্যবস্থাদি

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে গৃহীত ব্যবস্থাদি

ক. পারমাণবিক কৃষি প্রযুক্তি

FAO* এবং আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি কার্যক্রমের মাধ্যমে স্বীকৃত খাদ্য ও কৃষিখাতে যেমন-প্রকৃতি, মাটি, শাক-সবজি, বৃক্ষ, প্রাণী, বায়ু এমনকি খাদ্যসামগ্রীতে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ (radio isotopes) ব্যবহারের মাধ্যমে পরিমাণগত, গুণগত বা রূপগত পরিবর্তন সাধনকে পারমাণবিক কৃষি প্রযুক্তি বলে।

গত তিন দশকে বাংলাদেশের কৃষিখাতে পারমাণবিক কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার উন্নত দেশের মতো ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে গৃহীত ব্যবস্থাদি

পারমাণবিক কৃষি প্রযুক্তির গুরুত্ব বা উল্লেখযোগ্য ব্যবহারসমূহ হলো:

(i) gamma-radiation উদ্ভিদ ও প্রাণীর রোগ-জীবাণু নিরাময়ে ভূমিকা রাখে। বিভিন্ন উদ্ভিদ, প্রাণী ও রোগের জন্য বিভিন্ন শ্রেণির নিউক্লিয়ার মেডিসিন রয়েছে।

(ii) তেজস্ক্রিয় পরমাণু ব্যবহার করে কৃষি উৎপাদন পদ্ধতিতে অনেক বিক্রিয়ার কৌশল নির্ণয় করা যায়। যেমন, তেজস্ক্রিয় পরমাণু ব্যবহারের দ্বারা সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে গ্লুকোজ প্রস্তুতির কৌশলটি জানা যায়।

(iii) রেডিও আইসোটোপ-এর সাহায্যে উন্নতমানের শস্যবীজ সংরক্ষণ করা যায় এবং শস্যবীজের স্থায়িত্বও বৃদ্ধি করা যায়। সাধারণত শস্যবীজের গুণগত মান এক বছর সঠিক থাকলেও রেডিও আইসোটোপ-এর সাহায্যে এর স্থায়িত্ব পাঁচ বছর বা দশ বছর অর্থাৎ দীর্ঘস্থায়ী করা যায়।

(iv) radiation এর মাধ্যমে শস্য বীজের গুণগত মানের পরিবর্তন করে উৎপাদনও বৃদ্ধি করা যায়। যেমন: লবণাক্ততা প্রতিরোধী শস্য বীজ উদ্ভাবন, উফশি বীজ উদ্ভাবনে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করা হয়। আমাদের দেশে গামারশ্মি প্রয়োগে উচ্চ প্রোটিনযুক্ত নতুন জাতের ছোলা ফরিদপুর-১, নতুন জাতের পাট এটম-38 এবং ইরাটম-24 ও বিনাশাইল নামক নতুন জাতের ধান উদ্ভাবন করা হয়েছে।

বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে গৃহীত ব্যবস্থাদি

(v) মাটি ও প্রাকৃতিক সম্পদের সুরক্ষা, গুণগত মান প্রত্যাশিত পর্যায়ে নেয়ার জন্য, চাষাবাদের ক্ষেত্রে কম পানির ব্যবহারে পরমাণু কৃষি প্রযুক্তি ভূমিকা পালন করে।

(vi) কঠিন শিল্পবর্জ্যকে রেডিও আইসোটোপ-এর সাহায্যে বিশেষ প্রক্রিয়ায় সারে রূপান্তরিত করে ফসলের জমিতে ব্যবহার করা যায়।

(vii) কোনো জলীয় দ্রবণে হাইড্রোজেন আয়নের প্রাবল্য বা শক্তিমাত্রা হলো PH, মাটির ক্ষেত্রে PH নির্ণয়, মাটির PH পরিবর্তন হলে গঠন কীরূপ হবে, ফসলের প্রকৃতি কীরূপ হবে সে সম্পর্কে পরমাণু কৃষি প্রযুক্তি ধারণা দেয়।

এছাড়া গবাদিপশুর সংজনন, পুনরুৎপাদন (reproduction), ব্যাকটেরিয়ামুক্ত নিরাপদ খাদ্য সংরক্ষণেও এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

খ. বায়োটেকনোলজি পদ্ধতি

Biotechnology বা জৈব প্রযুক্তি হলো এরূপ একটি বিষয় যা কোনো ব্যবহারিক উদ্দেশ্যে জীব কোষের কোনো উপাদান, কাঠামোকে পরিমিত পরিবর্তন (modify) এর মাধ্যমে একটি নতুন সৃষ্টিকে নির্দেশ করে। Bios শব্দের অর্থ জীবন এবং Technology শব্দের অর্থ প্রযুক্তি। কোনো জীবকে মানবকল্যাণে প্রয়োগের যেকোনো প্রযুক্তিকে বলা হয় বায়োটেকনোলজি বা জৈবপ্রযুক্তি। ১৯১৯ সালে হাঙ্গেরীয় প্রকৌশলী কার্ল এরেকি (Kerl Ereky) সর্বপ্রথম Biotechnology শব্দের প্রবর্তন করেন। এটি ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া হতে শুরু করে উদ্ভিদ, প্রাণী, আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান, কৃষি, শিল্প সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়। আধুনিক কৃষি জৈব প্রযুক্তি সম্পর্কে বলা যায়, Modern agricultural biotechnology includes a range of tools that scientists employ to understand and manipulate the genetic make-up of organisms for use in the production of processing of agricultural products.

বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে গৃহীত ব্যবস্থাদি

উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহকোষে থাকে জিন (Gene) যা বংশগতির একক। জিনের সাথে সম্পর্কিত দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) এবং RNA (Ribo Nucleic Acid)। মূলত DNA হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যা উক্ত উদ্ভিদ বা প্রাণীর বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে। এটি প্রধানত ক্রোমোসোমে থাকে। বংশগতির ধারক, বাহক ও নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে। DNA বংশগত চরিত্র বহন করে। জীবের বৈশিষ্ট্যসমূহ বংশপরম্পরায় অধঃস্তন প্রজন্মে স্থানান্তর করে। জীবের সকল শারীরতাত্ত্বিক ও জৈবিক কাজ-কর্মের নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে। যেসব জীবে (ভাইরাস) DNA থাকে না, সেখানে RNA হলো বংশগতির একক।

বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে গৃহীত ব্যবস্থাদি

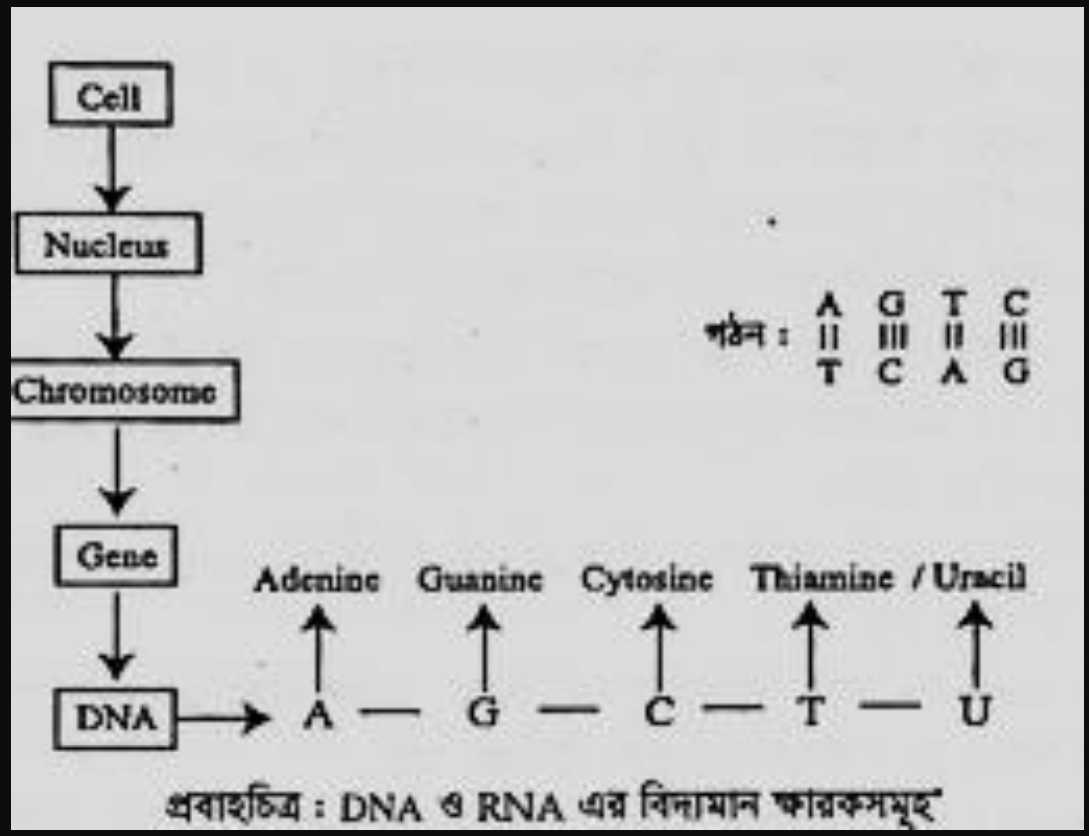

প্রবাহচিত্র : DNA ও RNA এর বিদ্যমান ক্ষারকসমূহ

বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে গৃহীত ব্যবস্থাদি

চিত্রে DNA এবং RNA এর গঠন পাঁচটি ক্ষারক উপাদানের সমন্বয়ে হয়। উপাদান পাঁচটি হলো: (i) Adenine, (ii)Guanine, (iii) Cytosine, (iv) Thiamine (DNA) এবং (v) Uracil (RNA)

এ পাঁচটি উপাদান ওপরের চিত্রে যেভাবে সাজানো আছে, তা পরিবর্তন করে উপাদানগুলোকে সামনে পেছনে স্থানান্তর করলে বা Combination পরিবর্তন করলে উদ্ভিদ বা প্রাণীর বৈশিষ্ট্যও পরিবর্তিত হবে। যেমন:

পূর্বে আর গাছ বড়, আম ছোট এবং টক ছিল। এখন এ গাছের DNA এর combination পরিবর্তন করলে দেখা যাবে আম গাছ ছোট, আম বড় এবং ফলন অধিক ও মিষ্টি জাতীয়। DNA এর combination পরিবর্তনের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি, স্বাদের পরিবর্তন, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত প্রভাব প্রতিরোধী শস্য উৎপাদন করা সম্ভব।

উদ্ভিদের জিন শনাক্ত করার পর এর মধ্যে অনাকাঙ্ক্ষিত জিনের পরিবর্তে কাঙ্ক্ষিত জিন প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হলে অধিক ফসল লাভ করা যায়।

বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে গৃহীত ব্যবস্থাদি

সম্পদ সীমিত কিন্তু বিপুল জনসংখ্যার ভারে আক্রান্ত দেশসমূহে জৈব প্রযুক্তির গুরুত্ব অপরিসীম। যেমন:

(i) বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশসমূহে নিয়মিত প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত। ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমন, উষ্ণতা বৃদ্ধি প্রভৃতির ফলে উক্ত দেশসমূহে যে প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা দেয়, একারণে সৃষ্টি হয় খাদ্য সংকট। বন্যা, খরা প্রভৃতি প্রতিকূল আবহাওয়া প্রতিরোধী শস্য উৎপাদন, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জৈব প্রযুক্তির গুরুত্ব রয়েছে।

(ii) উচ্চফলনশীল বীজ উদ্ভাবনে এর গুরুত্ব যথেষ্ট। প্রতিটি চাষের মাধ্যমে ৩০-৪০% ফলন অধিক বাড়ানো যায়। Hira, Aloron, Jagoron, Sonar Bangla, ময়না প্রভৃতি উচ্চফলনশীল ধান এর উদাহরণ।

(iii) অণুজীববিজ্ঞানীরা মানুষের স্বাস্থ্যসেবা, কৃষি, শিল্প ও পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে; মাছের পোনার কৃত্রিম প্রজননে, অধিক ও দ্রুত উৎপাদনের লক্ষ্যে জিন প্রতিস্থাপনে, পানিকে আর্সেনিকমুক্তকরণে এবং খাদ্যশস্যকে ক্ষতিকর ছত্রাক এবং কীটপতঙ্গের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করতে জৈব প্রযুক্তি ব্যবহার করছেন।

(iv) লবণাক্ত সহিষ্ণু ধান, শীত সহিষ্ণু পাট উদ্ভাবন জৈব প্রযুক্তির উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে লবণাক্ত এলাকা চাষের আওতায় আসবে এবং শীতকালেও পাট উৎপাদন করা যাবে যার ফলে কাগজ শিল্পসহ অন্যান্য শিল্পের কাঁচামালের অভাব দূর হবে।

বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে গৃহীত ব্যবস্থাদি

(v) সোনালী ধান থেকে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর উপাদান বাদ দিয়ে ß-carotene সমৃদ্ধ ধান উৎপাদনে (Genetically Modified Crops) এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

(vi) বায়োফার্মিং (Biopharming) শস্য উৎপাদন করা যায়। এরূপ শস্য প্রত্যন্ত গ্রামে বিদ্যুৎ ছাড়াও সংরক্ষণ করা যায়। এ শস্যের দাম কম তাই দরিদ্র দেশের জনগণ এতে উপকৃত হয়।

(vii) বায়োফুয়েল (Biofuels) তৈরিতে জৈব প্রযুক্তি সহযোগিতা করে। জীবের অবশিষ্টাংশ, বর্জ্য, মল-মূত্র, বৃক্ষ ও গুল্ম (ছোট প্রজাতির উদ্ভিদ) প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে বায়োফুয়েল তৈরি করা যায়। এর ফলে পরিবেশ দূষণ কম হবে বরং উষ্ণতা হ্রাস পাবে। ফুয়েল আমদানি হ্রাসের কারণে বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ বৃদ্ধি পাবে।

(viii) এ পদ্ধতির সাহায্যে, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (BCSIR) স্পিরুলিনা (অত্যন্ত উপকারী শৈবাল যেখানে রয়েছে প্রোটিন, আয়রন, পটাসিয়াম, দস্তা, ক্যালসিয়াম এবং বি ভিটামিনসহ অনেক পুষ্টি) উদ্ভাবন করেছে।

(ix) টিস্যুকালচার প্রযুক্তি ব্যবহার করে উদ্ভিদ বা প্রাণীর কোষকে সজীব রেখে দেহের বাইরে বৃদ্ধি ঘটানো এবং সমগুণধর্মী অসংখ্য অণুচারা সৃষ্টি।

বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে গৃহীত ব্যবস্থাদি

গ. আইসিটি

বাংলাদেশ বিপুল জনসংখ্যার ভারে আক্রান্ত একটি কৃষিপ্রধান দেশ হলেও এখনও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। প্রতি বছরই আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে কৃষির বিভিন্ন উপখাত বা খাতের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে কৃষির বিভিন্ন প্রয়োজনীয় তথ্য ও সেবা কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করেছে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (Information & 'Communication Technology-ICT) বর্তমানে স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প ও সেবা প্রতিটি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। কৃষিতে-

(i) সাধারণ কৃষি সমস্যা-সমাধান, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা-সমাধান, ফসলে রোগের আক্রমণ, কীটনাশক প্রয়োগ, পরিবেশবান্ধব কীটনাশক (জৈব কীটনাশক) প্রভৃতি সম্বন্ধে ধারণা লাভ।

(ii) উদ্ভাবনী কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার যেমন- নতুন নতুন কৃষি যন্ত্রপাতি; উন্নত বীজ, সার ও কীটনাশক; সর্বোত্তম টেকসই প্রযুক্তি নির্বাচন প্রভৃতি সম্বন্ধে ধারণা লাভ করা যায়।

(iii) উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য কৃষি উপকরণ ব্যবহারবিধি যেমন- সার, কীটনাশকসহ আধুনিক কলা-কৌশলের ঠক প্রয়োগ জানা যায়।

(iv) শস্যের জাত ও কৃষি উপকরণ সংরক্ষণ, নতুন জাত ও উপকরণ উদ্ভাবনের সকল তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণ ICT ব্যবহারের মাধ্যমেই সম্ভব।

বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে গৃহীত ব্যবস্থাদি

(v) প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাস ICT এর সাহায্যে কৃষক লাভ করতে পারে।
(vi) মাটির গুণাগুণ, রোগবালাই ও তার প্রতিকার সম্পর্কে জানতে এটি সাহায্য করে।
(vii) কৃষিবিজ্ঞানী, গবেষক প্রভৃতির সাথে শক্তিশালী যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

কৃষি উন্নয়নে, জনকল্যাণমুখী সরকার কৃষকদের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে, মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য প্রতিরোধ বা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বিভিন্ন কৃষি উপকরণের দাম নির্ধারণ করে দেয়। ICT এর সাহায্যে সমগ্র দেশের কৃষক এ তথ্য দ্রুত অবগত হতে পারে। এর সাহায্যে সরাসরি ব্যবসায়ীদের সাথে কৃষকদের যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

উচ্চফলনশীল বীজ উদ্ভাবনের তথ্য কৃষকরা এর মাধ্যমে জানতে পারে, আবার কৃষকরাও যদি নতুন কিছু উদ্ভাবন করতে পারে এ তথ্যও দ্রুত গবেষণাগারে পৌঁছতে পারে। যেমন কোনো একজন কৃষক অর্থের অভাবে অল্প পরিমাণ ইউরিয়া সার ক্রয় করে ছিটিয়ে দেয়ার পরিবর্তে পানিতে গুলিয়ে 'স্প্রে' করে দিলেন। কিন্তু এতে দেখা গেল উক্ত কৃষকের ফলন ভালো হলো। বিষয়টি গবেষকেরা জানার পর তাঁরা গবেষণা করে নিশ্চিত হলেন যে, ছিটিয়ে দিলে বেশি ইউরিয়া লাগবে, স্প্রে করে দিলে কম লাগবে। তাঁরা আরও বের করলেন কতটুকু জমিতে কতটুকু ইউরিয়া কীভাবে স্প্রে করলে অধিক ফলন পাওয়া যাবে। এছাড়া, কৃষিতে কোন রোগের জন্য কী ধরনের কীটনাশক, কতটুকু পরিমাণে ব্যবহার করা যাবে, এসব ICT এর সাহায্যে কৃষক জানতে পারে।

বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে গৃহীত ব্যবস্থাদি

কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন: উন্নত বীজ*

বিশ্বের জনসংখ্যা অপ্রতিরোধ্য গতিতে ক্রমবর্ধমান। কিন্তু এ বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য প্রয়োজনীয়, স্বাস্থ্যবান্ধব খাদ্যের যোগান দেয়ার উৎস ও পরিমাণ বিভিন্নভাবে ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে। সবার জন্য খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হলে উন্নত কৃষি প্রযুক্তি, বীজ এবং দক্ষ মানবসম্পদের ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য। ১৯৬০ এর সবুজ বিপ্লবের (Green Revolution) পর ফিলিপাইনের ম্যানিলায় International Rice Research Institute (IRRI) কৃষিতে সর্বপ্রথম উন্নত বীজ, রাসায়নিক সার, পানিসেচ এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে High Yielding Variety Technology (HYV Technology) বা উচ্চফলনশীল প্রযুক্তি (উফশি প্রযুক্তি) প্রয়োগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অনেকে এ প্রযুক্তিকে 'সার-সেচ-বীজ প্রযুক্তি (Fertilizer Irrigation Seed Technology-FIS Technology) হিসেবে বিবেচনা করেন।

অতএব, যে বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান, কৌশল এবং যন্ত্রপাতি প্রয়োগ বা ব্যবহার করে তুলনামূলকভাবে স্বল্প সময়ে, স্বল্প ব্যয়ে, প্রতিকূল পরিবেশে কৃষির ফলন বা উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা যায়, তাকে কৃষি প্রযুক্তি (Agricultural Technology) বলে। কৃষি প্রযুক্তি কোনো স্থির বিষয় নয়, এটি চলমান ধারণা। সময় ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে চাহিদার আলোকে প্রযুক্তির উদ্ভাবন ঘটে। কৃষি প্রযুক্তির প্রধান উপকরণ হলো- উচ্চফলনশীল বীজ, কীটনাশক, সার, ট্রাক্টর, পাওয়ার পাম্প, হারভেস্টার, উইডার ইত্যাদি।

বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে গৃহীত ব্যবস্থাদি

আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠান (IRRI) এর ন্যায় বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (BRRI), বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে কৃষি প্রযুক্তি বিশেষ করে উচ্চফলনশীল বীজ উদ্ভাবন, পরমাণু ও জৈব প্রযুক্তি এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রয়োগ-এর মাধ্যমে ব্যাপক সফলতা এনে দিয়েছে। দেশের মোট উৎপাদিত ধানের ৫৫ ভাগই বিআর-২৮ এবং বিআর-২৯ জাতের ধান।* সত্তর দশকের প্রথম দিকে প্রবর্তন করা হলো উচ্চফলনশীল জাত আইআর-৮ ও তিন মৌসুমে চাষের উপযোগী বিআর-৩ (বিপ্লব ধান); এর মাধ্যমে, আধুনিক ধান চাষের গোড়াপত্তনের মাধ্যমে ধান উৎপাদনে বিপ্লবের সূচনা হয়। IRRI এর গবেষণার প্রেক্ষিতে ইরি-৫, ইরি-৮, ইরি-২০ এবং বাংলাদেশে বিআর-১ (চান্দিনা), বিআর-২ (মালা), বিআর-৩ (বিপ্লব), বিআর-৪ (ব্রিশাইল), বিআর-৭ (বালাম), ব্রি ধান-৭৫ (কাণ্ড শক্ত, হেলে পড়ে না, চালে সুগন্ধি আছে); ব্রি ধান-৭৬, ৭৭ (দেশের দক্ষিণাঞ্চলে চাষযোগ্য), ব্রি ধান-৭৮ (লবণাক্ততা অঞ্চলে চাষাবাদ), বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভাবিত 'বিইউ ধান-২, রাবি ধান-১ (আবাদ ওঠতে লাগবে ১৩০ দিন, চিকন মিনিকেট চাল উৎপন্ন হবে), বিনা গম-১, বারি-৭২ ও ৭৩ আলুর জাত, বিএসআর-আই আখ-৪৫, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত আলুর ২টি জাত (বারি আলু-৭৮, বারি আলু-৭৯) এবং বারি গম-৩৩, বিনা মরিচ-১' ইত্যাদি উদ্ভাবিত উচ্চ ফলনশীল, প্রতিকূল আবহাওয়ায় উৎপাদনক্ষম, রোগ-বালাই প্রতিরোধী বীজ-এর ব্যবহার হচ্ছে।

বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে গৃহীত ব্যবস্থাদি

বাংলাদেশে কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবনের গুরুত্ব

বাংলাদেশ একটি জনবহুল কৃষিপ্রধান দেশ। এখনো ২০.৫ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। জাতীয়ভাবে ৩৫.৪ শতাংশ মানুষ এখনো ভূমিহীন, গ্রামে এই হার ৪৭.৫ শতাংশ। জনসংখ্যায় ৪৫.১ শতাংশ মানুষের মাথাপিছু জমির পরিমাণ ০.১৫ একর অপেক্ষা কম। Human Development Report 2020 অনুযায়ী বিশ্বের ১৮৯টি দেশের মধ্যে মানব উন্নয়নে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩৩তম-২০১৪ সালে ছিল ১৪২তম। এসব তথ্য প্রমাণ করে বাংলাদেশ - খাদ্য নিরাপত্তার ঝুঁকিতে রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবনের গুরুত্ব অপরিসীম। যেমন-

১. নতুন জাতের শস্য বীজ উদ্ভাবন: জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় লবণাক্ততা ও খরাপ্রবণ এলাকার জন্য অথবা বন্যাপ্রবণ এলাকার জন্য বিদ্যমান কৃষি যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপকরণ ব্যবহারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ শস্যের নতুন জাত উদ্ভাবন অত্যন্ত জরুরি। এক্ষেত্রে BJRI এর ৫১তম জাত উচ্চফলনশীল 'তোষা পাট-৮' এবং ব্রি উদ্ভাবিত বিটাক্যারোটিন সমৃদ্ধ 'গোল্ডেন রাইস' ব্রি ধান-২৯ যা ভিটামিন এ রোগের প্রতিরোধক হিসেবে প্রমাণিত হচ্ছে। পাতা ঝলসে যাওয়া তথা ব্লাস্টরোগ প্রতিরোধী 'বাউ-ধান-৩' নামে একটি নতুন জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে।

বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে গৃহীত ব্যবস্থাদি

২. উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি: উন্নত কৃষি উপকরণ যেমন ধান কাটার সময় কাঁচির পরিবর্তে হারভেস্টার ব্যবহার করলে অল্প শ্রমের সাহায্যে অধিক উৎপাদন করা সম্ভব হয়। একইভাবে উন্নত বীজ, সার, কীটনাশক ব্যবহার করলে উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পাবে।

৩. অধিক উৎপাদন : কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে একই আয়তনের জমিতে পূর্বের তুলনায় অধিক উৎপাদন পাওয়া সম্ভব। এর ফলে খাদ্য নিরাপত্তার ঝুঁকিও হ্রাস পাবে।

৪. দক্ষতা বৃদ্ধি : ক্রমাগতভাবে কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে ও জমিতে ব্যবহারের ফলে কৃষকদের কৃষি উৎপাদনের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

৫. কর্মসংস্থান : কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও কৃষিজমিতে প্রয়োগের মাধ্যমে বাড়তি শ্রমের প্রয়োজন হয়। এর ফলে বাংলাদেশের মতো শ্রমবহুল দেশে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে।

বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে গৃহীত ব্যবস্থাদি

৬. পরনির্ভরশীলতা হ্রাস: কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও
প্রয়োগের মাধ্যমে ফসল তথা খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে পরনির্ভরশীলতা হ্রাস পাবে। স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হবে।

৭. আয় ও জীবনযাত্রার মান: কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে সমগ্র অর্থনীতিই লাভবান হয়। কৃষকদের উৎপাদন, আয় ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে ধনিক শ্রেণির কৃষকরা অধিক লাভবান হলেও প্রান্তিক কৃষকদেরও অনেক প্রাপ্তি ঘটে।

এ ছাড়াও কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে কৃষিভিত্তিক শিল্পের প্রসার, শিল্পের কাঁচামালের যোগান, পরিপূরক শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণসহ অবকাঠামোগত অনেক উন্নয়ন সাধিত হয়।

বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে গৃহীত ব্যবস্থাদি

উন্নত বীজ উদ্ভাবন ও এর ফলাফল"

মানসম্মত বীজ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির প্রধান উপকরণ। অধিক হারে মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও কৃষকদের নিকট সরবরাহের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে কৃষি প্রযুক্তির অন্তর্ভুক্ত উপাদান হলো-

(i) উচ্চ ফলনশীল-উন্নত বীজ,

(ii) আধুনিক সেচ সুবিধার প্রয়োগ,

(iii) রাসায়নিক সার,

(iv) কীটনাশক এবং

(v) প্রাতিষ্ঠানিক কৃষি ও পল্লি ঋণ।পাট

বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে গৃহীত ব্যবস্থাদি

উপরিউক্ত উপাদানগুলোর প্রভাবে ফসলের ধরন পরিবর্তন, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, গ্রামীণ অর্থনীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছে। তবে সমাজে এর প্রভাব শুধু ইতিবাচকই নয় কিছু নেতিবাচকও রয়েছে। যেমন-

ইতিবাচক প্রভাব : কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ইতিবাচক প্রভাবসমূহ নিম্নরূপ-

(i) উৎপাদন বৃদ্ধি: বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে কৃষি প্রযুক্তি বিশেষ করে উন্নত বীজ উদ্ভাবন ও ব্যবহারের ফলে শস্যের বহুমুখীকরণ, নিবিড় চাষাবাদের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ধান, গম, ভুট্টা, পাট, ডাল, সবজি প্রভৃতির ফলন পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন জিন প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে রবি-১ নামে উদ্ভাবিত পাটের জাত সাধারণ তোষা পাটের জাত অপেক্ষা ২০ শতাংশ বেশি ফলন দিচ্ছে, উচ্চতাও তোষা অপেক্ষা ২০ সেন্টিমিটার বেশি, আঁশের পরিমাণও ২০ শতাংশ বেশি। সাধারণ তোষা পাট ১২০ দিন পর কাটতে হয় কিন্তু রবি-১ ১০০ দিনে কাটা যাবে। ২০ দিন বেঁচে যাওয়ায় একই জমিতে আমন চাষে সুবিধা পাবে।

বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে গৃহীত ব্যবস্থাদি

(ii) কর্মসংস্থান বৃদ্ধি : উন্নত বীজ ব্যবহারের মাধ্যমে সামগ্রিক কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় কর্মসংস্থানও বৃদ্ধি পেয়েছে, বেকারত্ব হ্রাস পেয়েছে।

(iii) আয় ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন: উন্নত বীজ ব্যবহারের মাধ্যমে ফলন ও আয় অধিক হওয়ায় গ্রাম ও শহরের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পেয়েছে।

(iv) সম্পদের কাম্য ব্যবহার: উন্নত বীজ ও প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সম্পদের কাম্য ব্যবহার নিশ্চিত করা হচ্ছে।

(v) জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন ক্ষমতা: বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি, পরিবেশ দূষণ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও তার ব্যবহার অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। অর্থাৎ অভিযোজনের অন্যতম উপায় হলো কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং তার ব্যবহার। যেমন ব্রি-৩৯ ও ৭১ ধান পরিবেশ ও জলবায়ুর সঙ্গে খ. খাওয়ার ফলে, এ জাতের ধান চাষে কৃষকরা উৎসাহিত হচ্ছে। ব্রি-৭১ এর ফলন তুলনামূলকভাবে অধিক হলেও উভয়ই পাট কাটার ১৫ দিন পূর্বে জমিতে কোনো রকম চাষ ছাড়াই বপন করা যায়। রিলে পদ্ধতির এরূপ চাষাবাদের এ ধান অন্যান্য ধানের চেয়ে প্রায় ১০ দিন পূর্বেই কাটা যায়। ব্রি-৭১ জাতের ধানের গাছ বড় হওয়ায় ভালো খড়ও পাওয়া যায়।

(vi) খাদ্য নিরাপত্তায় বাংলাদেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর বর্ধিত খাদ্য চাহিদা পূরণে তথা খাদ্য নিরাপত্তায় উন্নত বীজ উদ্ভাবনের গুরুত্ব অপরিসীম।

বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে গৃহীত ব্যবস্থাদি

নেতিবাচক প্রভাব : কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবনের নেতিবাচক প্রভাবসমূহ নিম্নরূপ :

(i) দেশীয় প্রজাতির শস্য বিলুপ্ত: উফশি বীজ ব্যবহারের কারণে শস্যের দেশীয় প্রজাতিসমূহ প্রায় বিলুপ্ত হওয়ার পথে।

(ii) সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি: সমাজে ধনী কৃষকরাই উন্নত বীজ, সার, সেচযন্ত্র, কীটনাশক ও প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের সুবিধা ভোগ করে থাকে। ভূমিহীন বা প্রান্তিক চাষিরা তেমন লাভবান হয় না, অথচ তাদের সংখ্যাই অধিক।

(iii) মাটির উর্বরতা হ্রাস: কীটনাশক ও রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ প্রকৃতিতে ছড়িয়ে পড়ছে। এর ফলে মাটির উর্বরতা ও গুণাগুণ নষ্ট হচ্ছে।

(iv) পানির স্তর হ্রাস: অতিরিক্ত সেচব্যবস্থার কারণে গভীর নলকূপ ব্যবহারের ফলে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে গৃহীত ব্যবস্থাদি

(v) মৎস্য উৎপাদনে: মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদন, বিচরণ ও খাদ্য চাহিদা পূরণ মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে।

(vi) অবাঞ্ছিত রোগবালাই: উচ্চফলনশীল প্রযুক্তি কৃষিতে প্রয়োগের ফলে অনেক নতুন নতুন অবাঞ্ছিত রোগবালাই-এর আবির্ভাব হচ্ছে।

পরিশেষে বলা যায়, অনেক নেতিবাচক দিক থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার সময়ের বাস্তবতা।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ২য় পত্র

অধ্যায় ০২ : বাংলাদেশের কৃষি

টপিক – ১০ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১. ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বনভূমির জেলা কোনটি? [কু. বো. '২৩]
(ক) ময়মনসিংহ (খ) সাতক্ষীরা (গ) নওগাঁ (ঘ) খাগড়াছড়ি

২. নিচের কোন উৎস থেকে বাংলাদেশের কৃষকরা বেশি ঋণ গ্রহণ করে? [রা. বো. '২৩]
(ক) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (খ) আত্মীয়-স্বজন (গ) ধনী কৃষক (ঘ) এনজিও

৩. বাংলাদেশের উৎপন্ন খাদ্যশস্য হলো- [য. বো. '২৩]
(ক) পাট (খ) তুলা (গ) ধান (ঘ) চা

৪. "ত্রুটিপূর্ণ ওজন ব্যবস্থা" কৃষিতে কোন ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করে? [চ. বো. '২৩]
(ক) উৎপাদনের সমস্যা (খ) কৃষিঋণের সমস্যা
(গ) কৃষি উপকরণ বিতরণে সমস্যা (ঘ) কৃষি বিপণনের সমস্যা

৫. উৎপাদনের প্রকৃতি অনুসারে কৃষি খামারকে কয় শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়? [ব. বো. '২৩]
(ক) ২ (খ) ৩ (গ) ৪ (ঘ) ৫

৬. কোনটির সাথে কৃষির সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে? [সি. বো. '২৩]
(ক) সুতা উৎপাদন (খ) শ্রম ব্যবস্থাপনা (গ) সমবায় গঠন (ঘ) দারিদ্র্য বিমোচন

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

৭. BRRI এর পূর্ণরূপ কী? [দি. বো. '২৩)
(ক) Bangladesh Rice Research Institute
(খ) Bangladesh Rice Recovery Institute
(গ) Bangladesh Rural Research Institute
(ঘ) Bangladesh Rural Recovery Institute

৮. জীবননির্বাহী খামারের ক্ষেত্রে কোনটি লক্ষ্যণীয়? [ঢা. বো. '২২]
(ক) খামারের আয়তন বড় হয়
(খ) পারিবারিক ভোগই একমাত্র উদ্দেশ্য
(গ) চাষাবাদ পদ্ধতি আধুনিক
(ঘ) কারিগরি দিকের কার্যকর প্রয়োগ

৯. HYV এর পূর্ণরূপ কী? [কু. বো. '২২, '২৩]
(ক) High Yielding Vegetable
(খ) High Yielding Variety
(গ) High Yielding Vaccination
(ঘ) High Yielding Variation

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১০. মাশরুম গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে-
(ক) ঢাকা (খ) গাজীপুর (গ) সাভার (ঘ) টাঙ্গাইল
১১. একই খামারে একাধিক শস্য উৎপাদন করাকে কী বলে? [ব. বো. '২২]
(ক) শস্য বহুমুখীকরণ (খ) নিবিড় চাষ পদ্ধতি
(গ) সমন্বিত চাষ পদ্ধতি (ঘ) একাধিক চাষ পদ্ধতি
১২. যে খামারের জমির পরিমাণ ২.৪৯ একর; তাকে কোন ধরনের খামার বলে? [চ. বো. '২২]
(ক) প্রান্তিক (খ) ক্ষুদ্রায়তন (গ) মাঝারি (ঘ) বৃহদায়তন
১৩. কৃষিপণ্যের পাইকারি বাজার কোন পর্যায়ের বাজারকে নির্দেশ করে? [চ. বো. '২২]
(ক) গ্রাম্য (খ) প্রাথমিক (গ) মাধ্যমিক (ঘ) চূড়ান্ত
১৪. কৃষিপণ্যের উৎপাদন পরিকল্পনার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত কোনটি? [চ. বো. '২২]
(ক) কৃষিজোত (খ) কৃষি উপখাত (গ) কৃষি কাঠামো (ঘ) কৃষি খামার

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ২য় পত্র

অধ্যায় ০২ : বাংলাদেশের কৃষি

টপিক – ১১ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

অধ্যাপক জামাল আহমেদ অর্থনৈতিক এক সেমিনারে "বাংলাদেশের কৃষিতে জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত প্রভাব" শীর্ষক এক আলোচনায় বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সাথে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে মেরু অঞ্চলের বরফ গলে সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে এর বিরূপ প্রভাব বেশি পড়ছে। উক্ত সেমিনারে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সামাজিক বনায়ন, পরিবেশবান্ধব শিল্প কারখানা স্থাপনসহ বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়। [ঢা. বো. '২২]

ক. কৃষিজোত কী?

খ. শস্যবহুমুখীকরণ কি খাদ্য ঘাটতিপূরণ করে? ব্যাখ্যা করো।

গ. তাপমাত্রা বৃদ্ধি বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদনকে কীভাবে বাধাগ্রস্ত করছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার উপায়সমূহ বিশ্লেষণ করো।

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

আব্দাল মিয়া একজন ক্ষুদ্র চাষি। প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ গ্রহণের জটিলতার কারণে গ্রাম্য মহাজন ও মধ্যস্বত্বভোগী দালালদের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করে চাষাবাদ করেন। ফলে মূলধন সংকট লেগেই থাকে। ইদানিং সরকার কৃষকদের সহায়তা করার জন্য ভর্তুকি প্রদানের মাধ্যমে কৃষকের মাঝে স্বল্পমূল্যে রাসায়নিক সার, উচ্চফলনশীল বীজ, কীটনাশক ইত্যাদি উপকরণ পৌছে দিচ্ছে। ফলে আব্দাল মিয়ার মত কৃষকেরা যথেষ্ট উপকৃত হচ্ছেন। [কু. বো. '২২]

ক. শস্যবহুমুখীকরণ কী?

খ. 'জীবননির্বাহী খামার' ও 'বাণিজ্যিক খামার' ধারণা দুটি ভিন্ন-ব্যাখ্যা করো।

গ. আব্দাল মিয়ার অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণের উৎসগুলোর বর্ণনা দাও।

ঘ. কৃষির উন্নয়নে সরকার কর্তৃক গৃহীত কৃষি উপকরণ বিতরণের ইতিবাচক দিকটি মূল্যায়ন করো।

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

. নিম্নে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (GDP) বিভিন্ন খাতের কাঠামোগত পরিবর্তন দেখানো হলো : [য. বো. '২২]

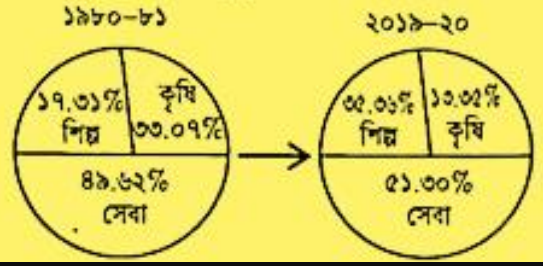

ক. কৃষিপণ্যের বিপণন কী?

খ. কৃষিজোত ও কৃষি খামার কি একই?

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত খাতসমূহের কাঠামোগত পরিবর্তনকে তুমি কীভাবে ব্যাখ্যা করবে?

ঘ. তুমি কি মনে করো, বাংলাদেশের কৃষির ক্রমাগত উন্নতি হচ্ছে? উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে ব্যাখ্যা করো।

THANK YOU